

বাংলাবুক.অর্গ

# ফ্রেড উলম্যান রিইউনিয়ন



১৯৩২ সাল। জার্মানির সামাজিক রাজনৈতিক জগতে

চলছে টালমাটাল অবস্থা।

ধীরে ধীরে হিটলারের নেতৃত্বে

নাৎসীবাদ মাথা চারা দিয়ে উঠছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমানের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জনমনে।

জার্মানির সামাজিক সাংস্কৃতিক জনজীবনে

শত শত বছর ধরে একাত্ম হয়ে যাওয়া ইহুদী পরিবারগুলির বিরুদ্ধে

জাগিয়ে তোলা হচ্ছে ঘৃণ্য বিদ্বেষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে

নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং কমিউনিস্টরা।

এই প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস।

উপন্যাসের নায়ক একজন কিশোর ইহুদী ছাত্র।

তার চোখ দিয়ে জার্মানির অন্যতম সুন্দর সहर স্টুটগার্টের

তথা যুদ্ধপূর্ব সমগ্র জার্মানির এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি

আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই উপন্যাস

প্রতিমুহুর্তে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে,

আমাদের ভাবায়, আবেগে আন্দোলিত করে।



# রিইউনিয়ন

ফ্রেড উলম্যান

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

## REUNION by Fred Uhlman

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

- [ ] **প্রকাশক**            হেমুকা স'হা ২০ কেমবচল সেন স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯
- [ ] **প্রচ্ছদপট**        প্রবীর সেন পি ১৩৪ সি আই টি রোড কলিকাতা ৭০০০১০
- [ ] **অলঙ্করণ**        রাহুল মজুমদার ২০/১ বি নবীন কুণ্ড লেন কলিকাতা ৭০০০০৯
- [ ] **মুদ্রাকর**            অসীম স'হা দি প্যারিট প্রেস ৭৩/২ বিধান সর্গী কলিকাতা ৭০০০০৩
- [ ] **প্রচ্ছদমুদ্রণ :**    স্পেকট্রাম .৭ মনীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা ৭০০০০৯

দশ টাকা

ভাষান্তর/শিশিরকুমার মজুমদার  
প্রকাশকাল/মাস ১৩২০

ওর সাথে আমার পরিচয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর কতদিন কেটে গেছে, আশায় হতাশায় সুখে দুঃখে কাজে কর্মে। নিশ্ফসা কত দিন ঝরে গেছে শুকনো পাতার মত! কত যুগ গেছে কেটে। আজও ওর স্মৃতি অম্লান!

আমার সুখের সাথী, দুঃখ হতাশার বন্ধু, ওকে যখন প্রথম দেখি, সে দিনের সেই বিশেষ মুহূর্তের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

আমার বয়স তখন ষোল, জন্মদিনের উৎসবের পর ছটো দিন কেটেছে। জার্মানীর শীতের দিন, বেলা তিনটে, বাইরে কুয়াশার অন্ধকার, তুষারপাত বন্ধ হয়েছে, ক্লাসে বসে আছি আমি। আমাদের স্কুল খুবই বিখ্যাত। পবিত্র রোম সাম্রাজ্য আর স্পেনের রাজা ছিলেন পঞ্চম চার্লস। তাঁর সামনে লুথারকেও ১৫২১ সনে দাঁড়াতে হয়েছিল, তাঁর আমলেই এই স্কুলের পত্তন। নাম কার্ল এ্যালেক্সান্ডার জিমনা-সিয়াম।

ভূরট্টেম্বার্গ এর অন্তর্গত স্টুটগার্ট সহরেই এর অবস্থিতি।

ভারী বন্ধ টেবিলে ভরা ক্লাসঘর বোঝাই ছাত্র। আলনায় এক পাশে জমা করে রাখা চল্লিশটা আধ ভেজা ওভারকোট, তা থেকে বেরোচ্ছে সৌন্দ্য গন্ধ। বাইরে দরজার কাছে তুষার গলা জলের প্যাচ প্যাচে কাদা রঙ চটা দেওয়ালে নানা দাগের নক্সা আঁকা। আগে দেওয়ালের এক পাশে কাইজার উইলহেলম আর ভূরট্টেম্বার্গের রাজার ছবি ঝুলত, এখন সেখানে চৌকো দাগ। সব কিছু আজও চোখ বুজলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখতে পাই আমার ছাত্র বন্ধুদেরও স্পষ্ট! অনেকেই তাদের পুঁজি দিয়েছে মুদ্র, হয় রাশিয়ান ফ্রাঙ্কে নয় তো আলামাইন এর মরু অঞ্চলে।

কানে ভেসে আসছে হের জিয়ারম্যানের এর উদাস গলা। ভাগ্য যেন ওকে স্কুল মাষ্টার করেই গড়েছিল। ফ্যাকাসে মুখ, দাড়ি গোঁফ

আর মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখের চশমা নাকের ডগায়। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সারাদিন খাওয়া হয়নি ওঁর! বয়স বড় জোর পঞ্চাশ, কিন্তু দেখলে আশী বলেই মনে হয়।

বোধহয় গরীব আর ভালমানুষ বলেই আমরা ওঁকে অবজ্ঞা করতাম। একটা ছোট ছ'কামরা বাসায় থাকতেন উনি। জলকল এসব ছিল ভাগের। পরনে পুরোনো রিপু করা একটা সবুজ স্মাট। শীতকালটা কাটাতেন ওটা পরেই। অন্য একটা স্মাট অবশ্য তাঁর ছিল বাকী সময়ের জন্য।

আমরা বোধহয় ওঁকে ঘৃণাই করতাম। খারাপ ব্যবহার করতাম ওর সাথে। নির্লজ্জ কাপুরুষ ছেলেগুলো যেমন তাদের থেকে দুর্বল বসহায় ছেলেদের উপরে দুর্ব্যবহার করত, তেমনি।

ক্লাসে অঙ্ককার ঘনো ছিল, আলোগুলো তখনও জ্বালা হয়নি, জানলা দিয়ে দুড়ে পুরোনো বিদ্যুৎ গীর্জা বাড়িটার চূড়া ছোটো বরফ পড়ে শুল্লর দেখাচ্ছিল। ওর পরেই বরফে ঢাকা পাহাড় শ্রেণী, যা আমাদের শহরকে ঘিরে আছে। মনে হত এরপরেই বুঝি পৃথিবীর শেষ, তারপরেই যেন অন্য কোন এক রহস্যলোকের শুরু!

আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম তাড়াবার জন্য নড়ে চড়ে ক্লাসে মাথার চুল ধরে টানছিলাম। হঠাৎ তখনই ঘরের বন্ধ দরজার টোকা পড়ল। হের জিয়ারম্যান আসতে বলার আগেই হেড স্যার প্রফেসর খেঁট ঘরে ঢুকলেন। ক্লাসের কারও নজর উঠে মত ছোট মানুষটির উপরে পড়ল না, অবাক হয়ে সবাই তাকাল আগন্তুক নতুন ছেলেটির দিকে, হেড স্যারের পিছন পিছন এসেছিল যে।

সত্যি বলতে কি আমরা যেন ভূত দেখলাম! চলনে বলনে ও যেন এক ভিন্ন জগতের কেউ! প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে যেন ও বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছিল বনেদি পরিবারের ছেলে ও। ওর পোষাক পরিচ্ছদ সেই পরিচয়ই বহন করছিল।

আমাদের মায়েরা ভাবেন যা একটা কিছু পরেই স্কুলে যাওয়া যায়। তা টেকসই হলে আরও ভাল। তাই, আমাদের জামা প্যাণ্টের রং জ্বলে গেলেও ছিড়ত না। তাই আমাদের পরতে হত।

তবে তখনও আমরা মেয়েদের পিছনে ঘুরতাম না বলে জামা প্যান্ট  
সম্বন্ধে তত নজরও দিতাম না ।

এ ছেলেটা কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের । পরনে বিদেশী কাপড়ের  
তৈরী হাঙ্কা ধূসর রঙের প্যান্ট । সত্ত পাট ভাজা ফিকে নীল সার্ট । ছোটোই  
নামী দজির দোকানের তৈরী । আর নীল টাইটা সাদা বুটকিদার ।  
আমাদের সবার টাইই প্রায় তেলচিটে পাকান দড়ির অবস্থায়  
পৌঁছেছে ।

প্রফেসর খেঁট সোজা এগিয়ে এলেন হের জিমারম্যানের দিকে ।  
ফিসফিস করে কি যেন বললেন তাঁকে তারপর নিঃশব্দে বার হয়ে  
গেলেন ।

আমরা তখনও অবাক হয়ে ছেলেটিকেই দেখছিলাম, শাস্ত ভাবেই  
দাঁড়িয়ে ছিল ও । চোখে মুখে লজ্জা বা ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই । বয়স  
ওর আমার থেকে একটু বেশীই হবে হয়ত । তবে ও যে সব বিষয়েই  
আমার থেকে অনেক বেশী চোঁকস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।  
সবার মাঝে ওকে তাই যেন আমার একেবারে আলাদা কেউ বলেই  
মনে হল ।

হের জিমারম্যান চশমা ঠেলে নাকের ঠিক জায়গায় তুললেন ।  
ডায়াসের উপর থেকেই তাকিয়ে ক্রাসের চারদিক দেখলেন । আমার  
সামনের বেঞ্চে খালি জায়গা দেখে, নেমে এসে ওকে সঙ্গে এনে সেখানে  
বসালেন । আমরা অবাক হলাম তিনি তখন ওর সামনে একটু  
ঝুকলেন । অমন তো করা হয় কাউকে সম্মান দেখাবার জন্য ! নিজের  
টেবিলে ফিরে গিয়ে তিনি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার  
উপাধি; নাম বলবে কি, জন্মেছ কোথায় ?

ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—উপাধি গ্রাফ্ ফন্ হোহেন্ফেলস্ ।  
নাম, খোন্‌রাডিন্, জন্ম, ১৯শ জানুয়ারী ১৯১৬ । জন্মেছি ভুট্টেন-  
বার্গের হোহেন্ফেলস্ বংশে ।

তারপর বসে পড়ল ও ।



আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। বয়স যা  
শুনলাম, তাতে তো ও আমার বয়সী। কিন্তু ও যে ভিন্ন জগতের  
লোক, সে চিন্তাটা গেল না মন থেকে। এ চিন্তা কিন্তু ও রাজা  
রাজড়ার ঘরের ছেলে বলে নয়। এ যেন কেমন একটা উপলব্ধি।

কত বড় বড় বংশের ছেলেরাইতো পড়ছে আমাদের স্কুলে। কারও  
বাবা বড় ব্যবসাদার, কারও বা মহাজন, তাছাড়া গীর্জার যাজক, রেলের  
বড় অফিসার তো অনেকেরই বাবা। আমাদের ক্লাসেই তো পড়ে  
ফ্রাইহার্ন ফন গাল বেচারী, বাবা ওর পেনসন পাওয়া মিলিটারি  
অফিসার। নামের সাথে ফন উপাধি থাকলে কি হবে, ছেলেদের মাখন  
কিনে দিতে পারেন না তিনি এখন, মারগারিন খাওয়ান। আরও  
আছে, ব্যারন ফন ফ্রাল্ডেশলুস্ট। হাইমফেন্ আম নেককারের ধারে  
ওর বাবার বিরাট হাবেলী। ওদেরই পূর্বপুরুষদের কেউ নাকি ডিউক  
এবারহার্ড লুড্‌উইগের কি একটা কাজ করে দিয়েছিলেন। আরও  
আছে, হবারটুস স্লাইম-গ্রাইম-লিখটেনস্টাইনের কুমার বাহাদুর। ও  
এতই বোকা যে রাজ বংশের ছেলে হয়েও নিজের সম্মান রাখা  
চলতে পারে না। সবাই ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে।  
এ কিন্তু একেবারে আলাদা। এই অঞ্চলে সবাই এক ডাকে  
হোহেনফেলস্‌দের চেনে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতায়ও ওদের  
নাম পাওয়া যায়।

টেম্ আর হোহেনজোল্লার্নের মার্কি এককালে মাথা তুলে থাকা  
ওদের বিশাল দুর্গটা এখন অবশ্য ধ্বংস স্তূপ। কিন্তু ওদের বংশের নাম  
এখনও সবার মুখে। আমিও জানি ওদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কথা,  
যেমন ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে অন্য আর পাঁচ জন ঐতিহাসিক  
বীরদের নাম—সিপিও আফ্রিকানাস অথবা হ্যানিবল অথবা সিজারে।  
হিলডেব্রাও ফন হোহেনফেলস্ ১১৯০ সালে হোহেনস্টাউফানের  
সম্রাট প্রথম ফ্রেডরিককে এসিয়া মাইনরে জলে ডোবা থেকে বাঁচাতে

গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন সম্রাট কালিকাডলুস নদীর জলে ভেসে  
যাচ্ছিলেন।

অন্যো ফন্ হোহেনফেলস্ ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের বন্ধু। এই  
হোহেনস্টাউফেন রাজবংশের রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

কি একথানা বই লেখার ব্যাপার তিনি সম্রাটকে খুবই সাহায্য  
করেছিলেন। ১২৪৭ সালে সালার্ণোর যুদ্ধে সম্রাটের কোলে মাথা  
রেখে মারা যান তিনি। কাটানিয়াতে দামী পাথরে তৈরী তার  
শবধারটি সমাধি ক্ষেত্রে চারটে পাথুরে সিংহের মাথায় বসান।

ফ্রেডরিক ফন্ হোহেনফেলস্ এর সমাধি আছে থ্রোসটার হির-  
সউতে। ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিসকে তিনিই পাকিয়ার যুদ্ধে বন্দী  
করেন। সেই যুদ্ধেই তিনি শহিদ হন। লিপজিগের যুদ্ধে মারা যান  
হ্যালডেমার ফন হোহেনফেলস্ ফ্রিটজ আর তার ভাই উলরিখ  
হুজনেই ১৮৭১ সালে সামপিগ্নির যুদ্ধে প্রাণ দেন। ছোটজন মারা  
যান আগে। বড়জন ছোটকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে গিয়ে প্রাণ  
দেন। আর তাদ্ধনের যুদ্ধে প্রাণ দেন আর এক ফ্রেডরিক ফন  
হোহেনফেলস্।

আজ আমার অবাক দৃষ্টির সামনে একই ঘরে বসে আছে সেই  
বিখ্যাত বংশেরই একজন। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি নড়াচড়া আমি  
আগ্রহভরে দেখছিলাম। কেমন করে ও বই এর বায়না খুলল,  
আন্তে বার করে রাখল ফাউটেন পেনটা। ওর হাত কি সুন্দর, কত  
পরিষ্কার। আর আমার! ময়লা, কলিমখা। কলমের পাশে রাখল  
পেনসিল তারপর খাতা খুলে বসল। অবাক হয়েই সবকিছু  
দেখছিলাম আমি, মনে হচ্ছিল, যা কিছু ও করছে তা যেন কি এক  
নিয়মে বাধা। ও যেন এখুনি দাঁড়িয়ে উঠে হুকুম দেবে, সে হুকুমে কদম  
মিলিয়ে এগিয়ে যাবে একদল সৈন্য! সেই চিন্তাতেই ও যেন ওর  
সোনালী চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলোচ্ছে।

অত্যেক পিরিয়ডের শেষে ক্লাসের সবাই যখন একঘেয়ে পড়ার  
চাপে ক্লান্ত, ঘণ্টা শোনার জন্তু কান খাড়া করে বসে থাকে, আমি  
তখনই ওর দিকে চোখ ফেরাতাম।

কি মূল্যের চোখ মুখের আদল ওর, কি ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ট্রয়ের  
হেলেনকেও বোধ হয় কখনও কেউ এত খুটিয়ে দেখেনি, আমি যেমন  
করে ওকে দেখেছি। আর ওর তুলনায় আমি? আমি যেন কত  
কুৎসিত!

কি করে ওর সাথে ভাব করব আমি, কি করে কথা বলব, এই  
চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসল। মনে হ'ল, আমাদের মাঝে যেন যুগ  
যুগান্তরের ব্যবধান। ইওরোপের কোথায় কোন অখ্যাত গ্রামে আমার  
পূর্ব পুরুষরা যখন বাস করতেন, তখন ওর পূর্বপুরুষ ফ্রেডরিক ফন  
হোহেনফেলস তার স্ত্রীর মণিমুক্তো শোভিত হাত যত্নে ধরে প্রাসাদে  
এনেছিলেন।

আমি এক ইহুদী ডাক্তারের ছেলে। আমার পূর্ব পুরুষদের কেউ  
ছিলেন গ্রাম্য পুরোহিত, কেউ সামান্য ব্যবসাদার, কারও ছিল  
পশুপালনের ব্যবসা। কি আছে আমার অতীত ঐতিহ্য যা নিয়ে  
আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

মনে মনে ভাবলাম, হতে পারি আমি তুচ্ছ, কিন্তু আমি যা আমি  
তাই, আমারও মন বলে একটা জিনিস আছে, মান অপমান বোধ  
আছে। খারাপ ব্যবহারে আমিও আঘাত পাই। <sup>কিন্তু</sup> কি এসব  
কথা বুঝতে পারবে? বুঝতে পারবে, তুচ্ছ হলেও আমি ওরই মত  
একজন মানুষ। আমার মনে কি যে হচ্ছে তা কে বুঝবে?

বয়স ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কি কি বিষয়ে মিল আছে তাই  
ভাবতে চেষ্টা করলাম। এক জায়গায় আমরা দুজনেই এক, তা ওই  
মান সম্মান বোধ বিষয়ে। আর এই বোধটাই আমাকে আর এগোতে  
দিল না। হ্যাঁ, ওর সাথে আমি ভাব করতে চাই, কিন্তু করতে না  
পেরে ছটফট করতে লাগলাম।

অবাক কাণ্ড, ক্লাসের অন্য সবাই কেন যেন ভয়ে ভয়ে ওকে এড়িয়ে  
চলতে লাগল। এমন কি ক্লাসে যারা মস্তান, মুখে যাদের খারাপ  
কথা ছাড়া কোন কথা নেই, তারাও। ওর সামনে সবাই অন্য মানুষ,  
যেন কি এক যাত্রের ছোয়ায় হঠাৎ ভাব্য হয়ে পড়েছে সবাই!

যদি আমাদের কেউ ওর মত অমন জমকাল পোষাক পড়ে ক্লাসে

আসত, তাহলে সবাই মিলে ক্ষেপিয়ে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করত।  
কিন্তু ওর বেলায় সবাই চুপ।

এমন কি হের জিমারম্যানও যেন কেমন বদলে গেলেন! ওর  
সামনে ভেবে চিন্তে চলতে লাগলেন। ভয় যেন, পাছে ও বিরক্ত হয়!  
ওর হোমটাস্কের খাতা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, প্রতিটি লাইন শুধরে  
দিতেন, আর এই কাজে তিনি অনেক বেশী সময়ও দিতে লাগলেন।  
অথচ আমাদের খাতায় জুটেতে লাগল সেই একঘেয়ে একই টিপ্পনি:  
এর মানে কি? বাজে লেখা, হয়নি, ঠিক করে লেখ।

আমরা যে ওকে এড়িয়ে চলতাম তার জন্য ওর মোটেও ভাবনা  
ছিল না। ব্যাপারটা যেন খুবই স্বাভাবিক, এমন ভাব দেখাত ও।  
তবে ওর চালচলনে না ছিল অহঙ্কারী ভাব না ছিল নাক উচু।  
সে ব্যাপারে ও ছিল ক্লাসের আর পাঁচটা ভাল ছেলের মতই। তবুও  
ওর ব্যবহার ছিল কেমন যেন অন্য ধরনের। আর ওর সেই ব্যবহারই  
আমাদের কাছ থেকে বোধহয় ওকে আলাদা করে রেখেছিল।

যদি কখনও কেউ ওর সাথে কথা বলত, ও ভদ্রভাবে হেসেই তার  
উত্তর দিত। সামনে দিয়ে কেউ বাইরে গেলে ও উঠে ঘরের দরজা  
খুলে ধরত। এ সব ভব্যতা তো আমাদের কল্পনার বাইরে।  
আমার মনে হয় ওকে আমরা এড়িয়ে চলতাম ওর বংশ গৌরবের  
কথা মনে করেই। আমার মতই হয়ত অন্য সকলেও নিজের তুচ্ছ  
মনে করত ওর তুলনায়, এমন কি ক্লাসের ওই সব ব্যারণ আর  
প্রিন্সরাও।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন টিফিনের ছুটিতে ওই সব ব্যারণ  
আর প্রিন্সরা দল বেধে গেল ওর সাথে ভাব করতে। তাদের কিছু  
কথা কানে এল, বড় বড় পরিবারের কার সাথে কার কি সম্বন্ধ এসব  
কথাই হল কিছুক্ষণ? কিছুক্ষণ হাসাহাসিও। কিন্তু ওই পর্যন্তই।  
কদিন পরে আবার যখন ওরা ওর মুখোমুখি হল, ও হেসে মাথা নাড়ল  
শুধু। ব্যাস, আবার যেমন ছপক্ক ছপককে এড়িয়ে চলছিল, তাই  
চলতে লাগল।

এর কিছুদিন পরে ভাব করতে এগোলো ক্লাসে আতেল বলে

যাদের পরিচয়, সেই তিনজন। রিউটার, ম্যুলার আর ফ্রাঙ্ক। ওরা নিজেদের কেউকেটা ভাবত। বাকী ছেলেদের অবজ্ঞা করে এক সাথে চলাফেরা করত। ভাবখানা এমনই ছিল, ভবিষ্যতে ওরাই যেন এক এক বিষয়ে দিকপাল হবে। সময়ে অসময়ে হাতে ওদের দেখা যেত বদলেয়ার, রিমবাউড্ বা রিলকের মত লেখকদের লেখা গুরু গস্তীর বই। অঙ্কার ওয়াইল্ডের ডোরিয়ান গ্রে বা ফরসাইথ সাগার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওরা আলোচনা জুড়তো আবার কখনও মানুষের মনো-বিকার নিয়ে পণ্ডিতদের মত মতামত জাহির করত।

ফ্র্যাঙ্কের বাবা নাকি বড় ব্যবসাদার, তার বাড়িতেই ওদের আড্ডা জমত। ওখানে, উঠতি লেখক লেখিকা, অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনাগোনা ছিল। একজন চিত্রশিল্পীও আসতেন, তিনি নাকি কবে একবার প্যারিতে গিয়েছিলেন বন্ধু পাষলোর সাথে দেখা করতে। ওরা এই বয়সেই সিগারেট ধরেছিল। মাতব্বরের মত অভিনেত্রীদের নাম ধরেই ডাকত ওরা।

ফন্ হোহেনফেলস্কে দলে পেল, দলের রমরমা বাড়বে একথা বুঝতে ওদের দেরী হল না। ওরাও আলাপ করতে এগোলো।

ফ্র্যাঙ্ক-ই দলের মধ্যে তুখোড়। একদিন স্কুল ছুটির পর ওরা ওকে পথের মাঝে ধরল। বেশ কায়দা করেই ওদের ওই সাহিত্য চক্রের গল্প শোনাল। ওখানে ওরা যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে, সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আলোচনা করে, এসব কথাও শোনাল। শেষে বলল, ও যদি ওদের দলে যোগ দেয় তো খুবই ভাল হয়। তাহলে ওরা নতুন করে আরও কিছু করতে পারবে।

এই আঁতেলদের কথা বোধহয় জানত না খোন্‌রাডিন। সব কথা শুনে সে শুধু হাসল। বেশ ভদ্রভাবেই বলল,—আজকাল কয়েকটা বিষয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকি ভাই...নইলে...

নিরাশ হল আঁতেলরা।

ওকে আমার বন্ধু করব, এ কথাটা কবে কখন যে মনে করেছিলাম জানি না। আমার কোনও বন্ধু ছিল না। ক্লাসের কাউকেই আমার মনে ধরত না। সত্যি বলতে কি, আমি ভবিষ্যত নিয়ে কল্পনায় নানা স্বপ্ন দেখতাম। একটু যেন ভাবুকও ছিলাম। ভাবতাম বন্ধু হবে এমন একজন, যার সব কথা আর কাজই আমার ভাল লাগবে। যার বিপদে আমি প্রাণ দিতে পারব। যে আমাকে বুঝবে এবং আমিও তাকে বিশ্বাস করতে পারব।

এতদিন, আমার চারপাশ ঘিরে যারা ছিল, তারা আমার কল্পনায় গড়া বন্ধুর এই রূপের কাছে কিছুই না। আঁতেল তিনজন সম্বন্ধে অন্তরা যে যাই কিছু বলুক না কেন, আমার তাদের নেহাত খারাপ লাগত না, কিন্তু কেন যেন তবুও ওদের আমি আমার মনের কোনে ঠাই দিতে পারিনি। আমাদের মাঝে তাই যাওয়া আসাও ছিল না। ওদের হাবভাব দেখে মনে হতো বড় হলে ওরা প্রত্যেকেই কেউকেটা হবে। তবে আমার মনে তো তেমন কোনও ইচ্ছা ছিল না।

জীবন সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিছু একটা আমাকে হতে হবে। তবে, আমি যেন কবিতা লিখতে পারি। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির সুন্দর রূপকে যেন ছোঁতে ভরে দেখতে পারি আর; এমন একজন বন্ধু যেন পাই যার জন্য প্রয়োজনে আমি যেন আমার সব কিছুই দিতে পারি।

আমার বয়সটাই তখন ছিল এমন যা আমাকে এমনি করে ভাবাত। হয়ত এ বয়সে অনেকেই এমন করে ভাবে। অল্প বয়স, নিম্পাপ মন আর তাজা শরীরই সবাইকে এমন ভাবুক করে তোলে।

কিন্তু সে ও বোধ হয় অল্প কিছুদিনের ব্যাপার। দেহ আর চারপাশের সব কিছু বদলাবার সাথে সাথেই সবার মনও বদলায়। আমারও হয়ত অনেক কিছু বদলে ছিল। কিন্তু আজ তিরিশ বছর

বাদে ভেবে দেখছি, না, আমার মনে খোন্‌রাভিন সম্বন্ধে তখন যে সব চিন্তা জেগেছিল তার সবটাই ছিল খাঁটি। হ্যাঁ প্রয়োজনে ওর জন্ত আমি প্রাণও দিতে পারতাম।

এই চিন্তাটা আজও আমার কাছে মধুর।

ওকে বন্ধু হিসাবে পেতে হবেই, এ চিন্তাটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ওর সব কিছুই আমার ভাল লাগে, ওর নাম ভাল, ওকে দেখতে ভাল, সুন্দর ওর চালচলন। আরও কত তো ফন্‌ উপাধিধারীদের ভীড় আছে ক্লাসে, কই কারও ব্যবহার তো ওর মত এত মিষ্টি নয়। ওর মাঝেই আমি আমার সেই স্বপ্নে দেখা কল্পনায় গড়া বন্ধুকে পুরোপুরি খুঁজে পেলাম।

কিন্তু কি করে নিজেকে তুলে ধরব আমি ওর সামনে? কি দিয়ে আমি ওর সাথে ভাব করব? দেবার কি আছে আমার? অমন যে আঁতেলরা তাদেরও তো ফিরিয়ে দিয়েছে ও। কি যে আছে ওর মনের গভীরে কে জানে, কি করে সেখানে আমি সাড়া জাগাব?

নিজেকে নিয়ে একলা থাকতেই যেন ও ভালবাসে। প্রয়োজন ছাড়া কই কখনও তো কারও সাথে কথা বলে না। তবে তো ওর মনের মত কাউকেই বন্ধু খুঁজে পায়নি।

কিন্তু আমি কি করে ওকে বোঝাব, আমি অসুখী। ক্লাসে এতদিন আর যাদের দেখেছে ও আমি তাদের দলের নই, আমিই ওর বন্ধু হবার যোগ্য।

সমস্যা, সমস্যা, কি করে যে এর সমাধান করব কে জানে? ক্লাসে সবার মাঝে এতদিন আমিও তো একলা ছিলাম, এখনও একলাই থাকব। হয়ত তাহলে কোনও দিন আমার এই নিঃসঙ্গতা ওর নজরে পড়বে। ও তখনই আমাকে চিনবে, আমাকে কাছে ডাকবে।

মন থেকে ওর চিন্তা মুছে ফেলে আবার আমি আমার জগতে ফিরে গেলাম। আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম, অস্পষ্ট কি যেন এক মধুর পরশ মাথা স্বপ্ন, হয়ত যার কোনও মাথা মুণ্ড নেই।

আবার সেই একঘেয়ে ছাত্র জীবন শুরু হল। ঘণ্টা বাজার সাথে

ক্রাসে বসা, বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকি, আর আবার কখন ঘণ্টা বাজার পর মুক্তি পাব তার কথা ভাবা।

ছাত্রদের পড়াই তপস্যা। একথা বলেন মাস্টার মশাইরা, গুরুজনরা জানি। কিন্তু বেশী না খেটেও সব পরীক্ষাগুলো যখন ভালভাবেই পাস করে যাচ্ছি আমি, তখন কে আর ও সব নিয়ে মাথা ঘামায়। আমি তো ক্রাসের এক সাধারণ ছাত্র। আছি, পড়ছি, এই পর্যন্ত। কারও নজরে নেই আমার উপরে। এতদিন তাই থাকতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল কে জানে, হয়ে পড়লাম সবজাস্তা! ক্রাসে সব কিছু আলোচনার মধ্যেই কথা বলা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্য আলোচনায় হয়ে পড়লাম মাতব্বর। মাদাম বোভারি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ টিপ্পনি ঝাড়তে আরম্ভ করলাম, হোমার নামে সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা, তা নিয়ে লেকচার। শিলার কে নস্যাৎ করে দিলাম। হাইনেকে বললাম ভবঘুরেদের কবি। জার্মান কবিদের মধ্যে গ্যেটের চেয়েও উঁচু আসনে বসালাম হোল্ডারলিনকে, ঘোষণা করলাম তিনিই শ্রেষ্ঠ।

কি ছেলেমানুষই না ছিলাম তখন। মাস্টার মশাইরা তো অবাক। এমন কি আঁতেল দলের ও নজরে পড়লাম। মোট লাভ হল এই, মাস্টার মশাইরা ভাবলেন, তাদের এত দিনের চেঁচানি ফলেই আমার জ্ঞানচক্ষু হঠাৎ খুলে গেছে। আমার মত নগ্নকে নিয়ে আবার তারা দ্বিগুণ উৎসাহে লাগলেন, একটা বিরাট কিছু করিয়ে নেবার আশায়। স্কুলের মুখ রাখব আমিই।

ফাউন্ট আর হামলেটের কঠিন অংশগুলো তারা আমাকে ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ করতে বললেন। এই কাজ অবশ্য আমি করলাম খুশি মনেই বেশ মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু কেন যে আমি হঠাৎ অমন বদলে গেলাম তা কি কেউই বুঝতে পারল?

স্কুলের কতৃপক্ষ ভাবতেন শরীর চর্চা করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই না। ওর পিছনে অর্থ ব্যয় ও এক ধরনের বিলাসিতা। ও সব আমেরিকা বুটেনের লোকদেরই পোষায়। তাই স্কুলে প্রতি



সপ্তাহে দু'ঘণ্টা মাত্র বরাদ্দ ছিল এর জন্য। ছাত্ররা পড়াশুনা ফেলে  
ওই সময়টুকু কসরৎ করলেই ঢের হবে ভাবতেন সবাই।

ম্যাক্স লোহার মশাই আমাদের কসরৎ শেখাতেন। বেঁটে গাঁট্টা-  
গোঁটা জোয়ান মানুষ তিনি। আড়ালে আমরা তাকে পেশল ম্যাক্স  
বলে ডাকতাম।

একটু বেশী বকা স্বভাবের হলেও তিনি সত্যিই চেষ্টা করতেন  
যাতে আমাদের বুক হাত পাগুলো একটু শক্ত হয়। তাই ওই দু'ঘণ্টায়  
উনি আমাদের দম ছুটিয়ে ছাড়তেন। ছাত্রদের তাড়াতাড়ি শক্ত পোক্ত  
করে তোলার জন্য উনি আমদানি করেছিলেন হরাইজেন্টাল বার,  
প্যারালেল বার, ভল্টিং হর্স এইসব কসরতের যন্ত্র। প্রথমেই তিনি  
জিমনাসিয়ামের চারপাশে ছাত্রদের দমছোটা করে ছোটাতেন।  
তারপর ওঠবোস করে, কোমড় বেঁকিয়ে শরীর চাক্ষা করতে হত।  
এর পরই শুরু হত ওই সব যন্ত্র নিয়ে বিশেষ কসরৎ যা আমাদের  
কাছে প্রায় অভ্যাচারের নামাস্তর হয়ে দাঁড়াত।

কি করে ওই সব যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে তা প্রথমে পেশল  
ম্যাক্স মশাই নিজেই কবার করে দেখিয়ে দিতেন। তারপর পড়তেন  
আমাদের নিয়ে। ওর কাছে যা ছিল অতি সহজ; আমাদের কাছে  
তাই বিভীষিকা, বিশেষ হরাইজেন্টাল বারের খেলটা। দেখে শুনে  
বেছে বেছে ছেলেদের তিনি ওটাতে ওঠাতেন। মাঝে মাঝে সেই  
দয়াটা আমাদেরও দেখাতেন। তবে বেশী ডাক পড়ত লৌহমানব  
নামধারী তার এক প্রিয় ছাত্রের। সে এগিয়েও যেত, কারণ বড়  
হয়ে মিলিটারি অফিসার হবার সখ ছিল ওর।

একদিন পেশল ম্যাক্স একটা নতুন কসরৎ দেখালেন হরাইজেন্টাল  
বারে। খুবই শক্ত কসরৎ। যার শেষটায় খেলুড়েকে শূন্যে ডিগবাজী  
খেয়ে নীচে নামতে হবে ছপায়ের উপরে। ব্যপারটা খুব সহজেই করে  
দেখালেন উনি। তারপর ছাত্রদের দিকে ফিরে তাকালেন। মানে,  
কে এগিয়ে আসতে চাও?

আমার কেমন যেন রোখ চেপে গেল। আর কেউ এগোবার আগেই  
আমি সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে।

অবাক পেশল ম্যাক্স মশাই একটু ইতস্তত করলেন। বলেই ফেললেন, সোয়ার্জ ভূমি? তারপর এগিয়ে যেতে বলে কিন্তু মাথা নাড়তে থাকলেন।

আমি হরাইজেন্টাল বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক যেমন ভাবে উনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি ভাবে হাত তুললাম। বারহুটো ধরে টেনে তুললাম গোটা দেহটাকে।

চারদিকে সবাই রুদ্ধশ্বাসে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কারও মুখে কথা ছিল না। ওরই মাঝে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল খোন্‌রাডিনের উপরে, ওর চোখে মুখেও বিস্ময়। ব্যাস, আমি ঠিক মত শরীরটাকে মোচড় দিলাম। ঝপ করে হাত ছেড়ে দিয়ে ভন্ট খেয়ে উন্টে ঝুলে পড়লাম বারে ছ'পা আটকে। দোল খেয়ে উঠে পড়লাম বারের উপরে। এক মুহূর্ত সেখানে থেমে শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে ধপ করে পড়লাম মাটিতে। যাক, এত কাণ্ডের পর আমি অস্তিত্ব আমার ছ'পায়ের উপরেই দাঁড়াতে পেরেছি।

চারদিকে চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারই মাঝে কজন হাততালিও দিল। সবাই তো আর হিংস্রটে নয়।

আমি কিন্তু সোজা তাকালাম খোন্‌রাডিনের দিকে, দেখলাম ও-ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

কদিন পরে ওর নজরে পড়ব বলেই আমি আমার জমানো পুরনো টাকাগুলো স্কুলে নিয়ে এলাম। এ সব আমার খুব ছেলেবেলা থেকেই। সেদিন এনেছিলাম একটা রাসের করিস্থিয়ান টাকা, পাল্লাস আথেনের একখানা প্যাঁচা মার্কা মুদ্রা আর অলেকজান্ডারের মাথার ছাপওয়ালা টাকা।

ওকে আসতে দেখেই টাকাগুলো টেবিলে ছড়িয়ে আতস কাচ হাতে ঝুঁকে পড়লাম। ভাব দেখালাম, যেন খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছি। ও সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল সব কিছু। কৌতুহল আর চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল,—এগুলো কি আমি একটু দেখতে পারি?

যে ভাবে পুরনো টাকাগুলো ও নাড়াচাড়া করল, তাতে বুঝলাম, এ

ব্যাপারে ওর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ওরও বোধহয় এই একই সখ কিছুক্ষণ পরে সে কথাই ও বলল। বলল—পাঁচা মার্কটা ওর ও আছে। তবে আলেকজান্ডারের মাথাটা নেই। কথা বলে বুঝলাম, ওর কাছে এমন সব পুরানো টাকা আছে, যা আমারও নেই। মাস্টার মশাই ক্রাসে আসতে ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ল। পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়াতে ও যেমন ভাবে আমার পাশ দিয়ে বাইরে গেল, মনে হল আমাদের আলাপের সব কথা ও ভুলেছে! তবুও মন আমার খুশিতে ভরে উঠল। আজই আমার সাথে ও প্রথম কথা বলল। এ নিশ্চয়ই শেষ কথা বলা নয়। অন্তত আমি তা হতেই দেব না।

দিন তিনেক পরে ১০ই মার্চ তারিখটার কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। হাঁটা পথে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, বসন্তের বিকাল, চারদিক শান্ত, উষ্ণ বাতাস বইছে। দূরের বাদাম গাছটায় বাদাম ধরেছে, আকাশে ডালপালা ছড়ানো ফুলগাছগুলোতেও ধোকা ধোকা ফুল মাথা দোলাচ্ছে। আকাশ সমুদ্রও নীলে নীল।

দেখলাম সামনেই ও দাঁড়িয়ে! ওর যেন কেমন দেটানি ভাব, যেন কার জন্তু ও অপেক্ষা করছে। আমি হাঁটার গতি কমলাম। ভাবলাম কি করব, ওকে কি পাশ কাটিয়ে যাব, কি কি...কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে গেল মন। পরক্ষণেই মনে হল, খামলে ব্যাপারটা বিশী হয়ে দাঁড়াবে, কি ভাবে ও! পৃথক তো সবার জন্তুই, সেখানে কে দাঁড়াবে কে চলবে তাতে কার কি?

কাহাকাছি পৌছাতেই ও কিন্তু ফিরে তাকিয়ে হাসল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বোকার মত হাত বার করে আমার হাত ধরল ও। বলল,—হ্যালো হাল।

আমার হাত তখন থরথর করে কাঁপছিল। সে মাত্র কিছুক্ষণের জন্তু, নিজেই সামলে নিলাম আমি। মন আনন্দে ভরে গেল, এতক্ষণ আমি মিছিমিছি কি সব আবোল তাবোল ভাবছিলাম। ও-তো আমারই মত ভীতু, লাজুক। আমার সাথে ভাব করবে বলেই আজ

এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন আমরা কি কথা বলেছিলাম তার কিছুই আর আজ মনে নেই। মনে আছে, এক ঘণ্টা ধরে আমরা হুজনে পথে পাইচারি করেছিলাম। তবুও আমরা সেদিন একে অন্ধের কাছে সহজ হতে পারিনি। কি যেন কিসের লজ্জা তখনও হুজনের মাঝে বাধা হয়েছিল। সে কি, তা কে জানে।

তবে এও বুঝেছিলাম, সেই শুরু। আমার জীবন আর নিঃসঙ্গ বন্ধুহীন থাকবে না। নিজেদের মাঝে ক্রমে বোঝাপড়া করে একে অন্যকে পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠব।

সেদিন ছাড়াছাড়ি হতেই আমি এক দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম। একলা ঘরে বসে কেন যেন প্রাণ খুলে হাসলাম নিজের মনে। নিজের সাথে নিজেই কথা বললাম। টেঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছে হল, জান, কি হয়েছে আজ? বলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রাণ খুলে গান গাইলাম। এক সময়ে বাবা মাকে বললাম,—আজ থেকে না আমার নতুন জীবন শুরু হল। কি খুশিই না আমি!

ভাগ্যিস তাঁরা কি যেন সব কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এনিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না। হয়ত ভাবলেন, এ আমার আর এক নতুন পাগলামি। বয়স বাড়ার মুখে সব ছেলেদেরই যা হয়। রাতে ভাল ঘুম হল না। কেমন যেন একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসল, সকালবেলা কি হবে কে জানে? হয়ত ও সব কথা ভুলেই যাবে। হয়ত এমন করে আমার সাথে ভাব করার জন্য পরেও নিজের উপরে নিজেই রাগ করবে। ভাববে, ভুল করেছে।

আমি যে ওকে কত চাই, সে কথা ওকে বুঝতে দিয়েও হয়ত আমিও ভুল করেছি। আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কি জানি, ওর বাবা মা হয়তো ভীষণ রাগ করবেন। বলবেন, খবরদার ইহুদীদের সঙ্গে মিশো না। তাহলে তখন কি হবে?

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল আমার। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। অনেক রাতে ঘুম এসে বাঁচাল।

সব ভয় আমার মিথ্যাই হল। ক্রাসে পৌঁছতেই খোন্‌রাডিন ক্রাজা আমার পাশে এসে বসল। ওর চোখে মুখে খুশির ছোঁয়াচ। কথায় কথায় ও বলল, রাত্রে ওর খুব ভাল ঘুম হয়েছে। আমাকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে ও নিশ্চিন্ত। ও জানে আমি ওকে কত গভীর ভাবে চাই। আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরকাল থাকবে।

লঙ্কায় আমি আর কোন কথাই বলতে পারলাম না।

এরপর থেকে সব কাজে সব ব্যাপারে আমরা দুজনে এক।

ছুটির পর একসাথে বাড়ি ফিরতাম। স্কুলে আসার সময় ও এসে মোড়ের মাথায় দাঁড়াত আমার জন্য। সেখান থেকে একসাথে আসতাম আমরা। ক্রাসের সবাই এনিয়ে প্রথমে টিপ্পনি কেটেছিল ক'দিন, তারপর ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিল, অবশ্য কজন বাদে, বোল্লাথার আমাদের মানিকজোড় নাম দিয়েছিল। আর আঁতেলরা মনে মনে ঠিক করেছিল, যে করেই হোক আমাদের মাঝে ঝগড়া বাধাবে।

পরের কমাস কি আনলোই না কেটেছিল আমার। বনুশ্চি আশ-পাশের গোটা অঞ্চল ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। ফলের ভারে গাছের ডালপালা হয়ে পড়ত। পপলার আর উইলো গাছের পাতায় রৌদের সাড়া জাগতো। আলোছায়া ঘেরা দূর পাহাড়ের ঢালে বাগিচাগুলো আগুর আর নানান ফলে যেত ভরে।

দেহাতি জমিদারদের চক মেলান দালানের ফোয়ারাগুলোর নক্সা-করা মুখ দিয়ে জলের ধারা নামত। তাদের পূর্বপুরুষদের বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান মূর্তিগুলো ওই পরিবেশে অপূর্ব দেখাত। নেক্‌কার নদী তার বৃকে জাগা চরের ছপাশ দিয়ে কুল কুল করে বয়ে যেত। এই সবকিছুই আমার মনে কি যেন কি এক নুখের খবর এনে দিয়েছিল।

শনিবার আমরা দুজনে ট্রেনে চড়ে কোনও বনের ধারে চলে

যেতাম । রাত কাটাতাম জঙ্গল ঘেরা কুটিরে । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর  
সাদাসিধে চমৎকার খাবার আর স্থানীয় ঘরে তৈরী হালকা মদ, তাই  
আমাদের মন আনন্দে ভরে দিত । কখনও চলে যেতাম ব্র্যাক ফরেস্টে ।  
ঘন জঙ্গলের ছায়ায় সেখানে ব্যাঙের ছাতার ছড়াছড়ি, আর গাছের  
গায়ে জমাট বাধা হলুদ আঠা, ঝরে পড়া চোখের জলের কঁোটর মত  
আলোয় ঝিকমিক করত । মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে পাহাড়ী  
ঝর্ণার ধারা, ট্রাউট মাছের ঝাঁকের খেলা তাতে । এপাশে ওপাশে দূরে  
দূরে জলের ধার ঘেসে করাত কল । কখনও চলে যেতাম আমরা  
পাহাড় চূড়ায় । উঁচু থেকে দেখা যেত দূরে রাইন নদীর উপত্যকা  
মাঝে বয়ে চলেছে ছরস্তু জলের ধারা । স্ট্রাস্‌বুর্গের গীর্জার চূড়াটা রোদ  
পড়ে ঝকমক করত ।

কখনও নেক্‌কার নদীর তীরে বসে জলের কল কল ধ্বনির মাঝে  
শুনতে পেতাম সেই চিরকালের সুর—

মলয় বাতাস

এনেছো বয়ে কোন সে বারতা

দূর ইতালির থেকে

তুমি কি এসেছো

ছায়া ঘেরা ঐ পপলার বন

প্রিয় কোন এক নদীর উপর দিয়ে

সে কি ড্যানিয়ুব

কল কল যার সুর

ছপাড়ে যাহার সবুজ বনানী

রঙ বেরঙের ফুলের সারি—

কখনও চলে যেতাম হেগাউ ! সাতটা নিভন্ত আগ্নেয়গিরির চূড়া  
সারা পরিবেশকে ভয়ঙ্কর রুদ্ধ রূপ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ।

যেতাম স্বপ্নে ঘেরা মায়ালোক কোন্‌স্টান্‌স্‌ হৃদের ধারে ।

একবার তো চলে গেলাম হোহেন্‌ফেলস্‌দের দুর্গ দেখতে । এদিকে  
ওদিকে ছড়িয়ে থাকা কিছু পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না  
সেখানে, জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজে ফিরতাম ক্রুসেডার্সদের যাত্রা পথের

চিহ্ন। যে পথ ধরে তাঁরা বাইজেনটিয়ান আর জেরুজালেম গিয়ে-  
ছিলেন। বহু চেষ্টা করেও অবশ্য সে পথের কোন চিহ্নই খুঁজে পাইনি  
আমরা।

অল্প দূরেই ছিল ট্রাবিডেন। অন্ধকারে আলোর খবর বয়ে আনা  
কবি হোল্ডারলিন তাঁর জীবনের ছত্রিশটা বছর এখানে কাটিয়ে  
গিয়েছেন। আমার প্রিয় এই কবির বন্দীশালার মত ছোট্ট ঘরের ছাদ





থেকে সামনে তাকালেই জোড়া হৃদের জলে গোটা আকাশের ছায়া  
ভাসতে দেখা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য !

মনে পড়ে আমাদের ছুজনের প্রিয় সেই কবিতাটা—

ফল ভারে নত বৃক্ষশাখা

ছপাশে ফুটেছে বন্য গোলাপ,

ছায়া ভাসে তার দীঘির জলে।

সুদূরের পিয়াসী, ওগো হাঁসের দল

বন্ধ করে পাখা থাম ক্ষণকাল।

পান করে যাও তৃষ্ণার বারি হেথা।

আমিও হেথায় শীতের তুমার বুকে  
থুঁজে মরি ফুল, একটু রোদের ছোঁয়া।



হাহাকার করে করে ব্যাথায় হিমেল বায়ু  
দুর্গ দেওয়াল ঘিরে,  
ভাঙ্গা কানিশে তুষারের কোঁটা বরে ।

ওগো হাঁসের দল, সুদূরের পিয়াসী  
ফিরে এসো, এসো ফিরে  
নত করে তব দীর্ঘ গ্রীবা  
পান করে যাও ছায়া ঘেরা এই জল ।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

এমনি স্মৃতিতে কেটে যেতে লাগল দিন। আমরা দুজনে দুজনকে নিয়ে যেন এক স্বপ্ন রাজ্য গড়ে তুললাম। বাইরের পৃথিবীর যা কিছু মন্দ, যা কিছু মলিন, তা আমাদের স্পর্শ করত না।

বাইরের পৃথিবী কিন্তু থেমে থাকে নি। থেমে থাকেনি রাজনীতি-বিদরা। তারা তাদের কাজ করেই চলছিলেন। জাতীয় ভাগ্যাকাশে ঝড়ের কাল মেঘ জমা হচ্ছিল। বাতাসে বাতাসে নানান গুজব ভেসে আসছিল। বার্লিনে নাকি রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ভীষণ গোলমাল বেঁধে গিয়েছে নাজি দল আর কমিউনিস্টদের মধ্যে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।

যাই হোক না কেন স্টুটগার্টের আকাশ বাতাস জুড়ে তখনও ছিল অটুট শান্তি। কখন কোথাও একটু আধটু গোলমালের কথা শোনা যেত বটে, তবে তা এমন কিছুই নয়। দেওয়ালে দেওয়ালে শুধু স্বস্তিক চিহ্নগুলো দেখা যেত। মাঝে মাঝে শোনা যেত, কোথায় কে যেন কোন ইহুদী ভদ্রলোককে মিথ্যা অপমান করেছে। কারা যেন কোথায় একজন কমিউনিস্টকে ধরে ঠেঙ্গিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনে এসবের কোন ছায়াই পড়ত না।

হোটেল রেন্ডোয়ার ভীড়, অপেরা হাউসের লাইন, সকালে বিকালে পার্ক ময়দানে লোকের আনাগোনা কিছুই কমল না।

এমনই সহজ ছিল স্টুটগার্টের সাধারণ মানুষের জীবন। রাজনীতি, সে তো সাধারণের জন্ম নয়। ও হল সামান্য কজন বিশেষ ধরনের মানুষের নাড়াচাড়ার বিষয়। তারা নিজেদের অনেক বড় ভাবেন। সাধারণের জীবনে তো অনেক সমস্যা, রাজনীতি করার মত সময় কোথায় তাদের।

আমার বয়সীদের চিন্তা ছিল অন্য। সামনে অচেনা অজানা জগৎ যেন তার অপার বিশ্বয় নিয়ে ছড়িয়ে আছে, তাকে জানতে হবে।

বুঝতে হবে জীবন কি ? কি তার মানে ? খুঁজে দেখতে হবে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সব কিছু রহস্যের শেষ । না জানার ভয় কে জয় করতে হবে ।

কোথায় কে রাজনীতি নিয়ে কি চিন্তা করছে, কি কথা বলছে, সে সব অবাস্তব । হিটলার মুসোলিনি এ ছোটো নামই মাত্র ।

স্বত্বের পরিবর্তন হল । আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল । ঝকঝকে দিনের আলোয় ক্ষেত ভরা পাকা থোকা থোকা আঙ্গুর বাতাসে ছলতে লাগল । পাকা ফলের ভারে মুয়ে পড়ল আপেল গাছগুলো । বাতাসে গ্রীষ্মের আমেজ এল । সাড়া পড়ে গেল স্টুটগার্টের ঘরে ঘরে । সবার মুখে তখন ছুটির কথা । কে কোথায় বেড়াতে যাবে তার আলোচনা । বাবা মা ভাবলেন সুইজারল্যান্ডের কথা । খোন্‌রাডিন সিসিলিতে যাবে তার বাবা মার সাথে । বাড়িতে বাড়িতে মেয়ে বাচ্চা বুড়ো সবাই মেতে উঠল । ঠিক তখনি এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার মনের সব কিছু বিশ্বাসকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল ।

আমি ভগবানকে মানতাম সুন্দর এমন একজন বলে, যিনি সবার ভাল করেন । বাবা কখনও ধর্ম নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতেন না । আমি চলতাম আমার মতেই । মাকে একদিন তিনি বলছিলেন, —যে যা খুশি বলুক না কেন, যীশু একজন জ্ঞানীত্বপূর্ণ পবিত্র ইহুদী প্রচারক । মানুষকে সত্য সুন্দরের পথ দেখাতেই এসেছিলেন । জেরেমি এজকেইলদের মত তিনিও মহান । কিন্তু কেন যে মানুষ তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে তা আমি বুঝতে পারি না । সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি তাঁর প্রিয় পুত্রের অমন নিষ্ঠুর করুণ ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেখতে পারতেন ? ছুটে আসতেন বাধা দিতে, যেমন সব বাবারাই আসেন । ওকথা বলা মানে তো প্রকারান্তরে মহান ঈশ্বরের নিন্দাই করা ।

যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বাবার বিশ্বাস না থাকলেও তিনি নাস্তিক ছিলেন না । ঈশ্বর চিন্তায় মানুষের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ এই কথাই বোধহয় তিনি ভাবতেন । তবে আমি যদি খ্রীষ্টান হতে চাইতাম তাহলে তিনি বোধ হয় বাধা দিতেন না, এমন কি বৌদ্ধ হতে চাইলেও । কিন্তু আমি যদি কোনও আশ্রম বা মঠে নাম লিখিয়ে সাধু হতে

চাইতাম তবে নিশ্চয় তিনি বাধা দিতেন। কারণ ও সব করা মানে পরগাহার মত বিনা কাজে জীবনকে নষ্ট করা, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। মার ব্যাপার ছিল আলাদা। তিনি সব কিছুই মানতে চাইতেন। আমাদের “প্রায়শ্চিত্তের দিন” তিনি সিনাগগে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। আবার ক্রিস্‌মাসে ক্যারোল গাইতেন। পোল্যান্ডের ইহুদী ছেলে-মেয়েদের সাহায্যের জন্য টাকা দিতেন, আবার খ্রীষ্টান সংস্হাকেও দিতেন ইহুদী ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টান করার জন্য।

আমি যখন খুবই ছোট তিনি আমাকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। মা, বাবা আর ছোট পুশি বেড়ালের জন্য ছিল সেই প্রার্থনা। তাঁর কাছে আমি ধর্ম সম্বন্ধে ওই টুকুই শিখেছিলাম। বাবার মতো তিনিও ধর্ম আঁকড়ে পড়ে থাকতেন না। সংসারে কাজকর্ম, সাধারণে দয়ামায়া, এই ছিল তাঁর ধর্ম বোধ হয় মনে মনে ভাবতেন, তাঁদের ছেলেও তাঁদের মতই হোক।

আমি তাই ইহুদীদের ঘরে জন্মে খ্রীষ্টানদের মাঝে বড় হয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে মনে একটি নিজস্ব ধারণা গড়ে নিয়েছিলাম, সে ধারণা ছিল খুবই সহজ সরল। সারা বিশ্বসংসারের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা সর্বশক্তিমান, তিনিই সব কিছুর মূলে। ইহুদীরা আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা সবাই তাঁর প্রিয় সন্তান, সবার মঙ্গলই তাঁর চিন্তা। এ নিয়ে কারও সাথে তর্ক বিতর্কে যেতাম না আমি।

আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এক কৃষক পরিবার। দুই মেয়ে এক ছেলে তাঁদের, মেয়েদের বয়স চার আর সাত, ছেলের বার। আমার সাথে তাদের তেমন পরিচয় ছিল না। ছেলে মেয়েরা এত ছোট ছিল যে ভাব করবার প্রশ্নই উঠে না, আর কর্তা গিন্নী ছিলেন এতই বড় যে আমিই তাঁদের এড়িয়ে চলতাম কিন্তু তাঁদের আমি জানতাম, চিনতাম। বাবা মার হাত ধরে ছেলে মেয়েদের বাগানে বেড়াতে দেখতাম, কখনও দেখতাম মেয়েদের দোলনায় দোল দিচ্ছেন বাবা। তাদের হাসি আনন্দে বাগান ভরে যেত।

এক রাতে আগুন লাগল ওদের বাড়িতে। বাবা মা তখন বাইরে গেছেন, বুড়ি ঝিও কি কাজে যেন কোথায় গিয়েছিল; মুহূর্তে লকলকে

জিত মেলে আগুন গোটা বাড়িটাকে গিলে ফেললো, সে কি ভয়ঙ্কর আগুন ! দমকল আসার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল । তিনটে অসহায় বাচ্চা সেই আগুনে হারিয়ে গেল চিরকালের মত !

আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম । কিছুই দেখিনি । শুনি নি মা বাবার বুক ফাটা আতি, বুড়ি ঝি়ের আকুতি ।

পরদিন দেখলাম পোড়া দেওয়ালগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে । এখানে ওখানে ছাইগাদার মধ্যে ছড়িয়ে আছে আধপোড়া কতগুলো পুতুল, ঝলসে যাওয়া গাছে দোলনার দড়িটা মরা সাপের মত হাওয়ায় ছলছে ।

আমি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কথা শুনেছি, অগ্নিউৎপাতের কথাও পড়েছি । লাভার স্রোতে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়; হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ হয় পীত ইয়াংসী নদীর বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভেসে যাওয়ার কথাও জানি । জানি এক ভারত্বনের যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছে কত সৈন্য । জানি, সব-ই জানি ।

কি জানি, এসব হয়ত আমার কাছে শুধু সংখ্যার হিসাব মাত্র । চোখের আড়ালে বহু দূরে বহু অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা মাত্র । যা মনকে ভাবায় ছুঁতে ভরে তোলে, কিন্তু তেমন করে নাড়া দেয় না । কি জানি, হয়ত লক্ষ লক্ষ জনের জন্ত একজনের ছোট মন এত ছুঁখ সহ্য করতে পারে না ।

কিন্তু পাশের বাড়ির পরিবারের ঐ ভয়ঙ্কর সর্বনাশ আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিল । ছোট ছোট তিনটে শিশুকে আমি জানতাম, আমি তাদের দেখেছি আমার এই ছোটো চোখ দিয়ে দিনের পর দিন । এতো একেবারে অচ্য ব্যাপার ।

কি করেছিল ওই অসহায় তিনটে বাচ্চা ? কি করেছিল ওদের বাবা মা ? যার জন্ত এমন ঘটল । কেন, কেন এমন ঘটল ? তবে কি ভগবান বলতে কিছুই নেই ? ও সব আমাদের মনের মিথ্যা কল্পনা ! না কি তিনি আছেন, অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক রূপ ধরে । কিম্বা, তিনি থাকলেও তাঁর কিছুই করার কোন ক্ষমতা নেই !

বন্ধুর কাছে জোড় গলায় এসব সম্প্রদেহের কথা প্রচার করলাম

একদিন ।

ওরা গোঁড়া প্রটেষ্ট্যান্ট আমার কথাগুলো ও তাই মানতে পারল না। তবে স্বীকার করল, অমন করুণ ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণ ও নিজেও বুঝতে পারছে না। কোথাও একটা কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে। হয়ত যা বোঝার মত বয়স বা জ্ঞান আমাদের নেই। পৃথিবীতে যুগ যুগান্তর ধরে কত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ঘটনাই না ঘটেছে তবুও তো কই মানুষ জন ঈশ্বরের বিশ্বাস হারায় নি। মহাপুরুষরা নিশ্চয়ই এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তাঁরা এর উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের নির্দেশেই সাধারণ মানুষরা বিশ্বাসের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে।

ওর কথা আমি মানতে পারলাম না। ভীষণ ভাবে বাধা দিয়ে বলেছিলাম,—মহাপুরুষ নামধারী কতগুলো ভণ্ড বুড়ো কি বলে গেছে তা আমি মানি না।

কল্পনা করতে পারা যায়, তিনটে নিষ্পাপ অসহায় বাচ্চা আগুনের বেড়াজালে আটকা পড়ে আতঙ্কে চোঁচাচ্ছে। চারপাশ ঘিরে ভয়ঙ্কর যত্ন ওদের একটু একটু করে গিলতে আসছে। উঃ !

তুমি বলছ সর্বশক্তিমানের এই কাজের পিছনে কারণ আছে ? না না, যুগান্তরের অন্ধ বিশ্বাস ভগবান সম্বন্ধে তোমার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে ছাড়া বাঁচার কথা তুমি কল্পনা করতে পার না।

কিন্তু ভেবে দেখ, কি প্রয়োজন তেমন ভগবানের, যিনি মেঘের রাজ্যে বসে থেকে নিষ্করণভাবে ম্যালেরিয়া কলেরা ছাড়া আর যুদ্ধ সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। না কি, এত নিষ্ঠুর বা এতই ক্ষমতাহীন তিনি যে এইসব ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে দেখেও চুপ করে বসে আছেন।

খোন্‌রাডিন বলল,—না ভাই, তোমার এসব কথার কোন উত্তরই আমার জ্ঞান নেই। আমি আমাদের গীর্জার যাজককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। তিনি নিশ্চয়ই সব কথার উত্তর দিতে পারবেন।

কদিন পরে ও এসে বলল, যাজক ওকে সব কিছুই ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি যা কিছু সেদিন বলেছি তা ছেলেমানুষি

উচ্ছাস ছাড়া আর কিছু নয়। অল্প বুদ্ধি, অবাস্তব কল্পনা, আর অজ্ঞতাই যার মূল। আমার বলা কথাগুলো শোনাও নাকি পাপ।

আমার মনে হল যাক্ক ওকে সব কথা খুলে বলেননি, তা নয়তো খোন্‌রাডিন হয়ত ঠিক মতো বুঝতে পারেনি। কই ও তো আমার সন্দেহ সম্বন্ধে খোলাখুলি কিছুই বলল না। ও বলল সেই পাপ পুণ্যের কথা। পাপ আছে বলেই মানুষকে পুণ্যের কাজ করতে হবে। সারা বিশ্ব জুড়ে চারদিকে এত সব কুৎসিত কিছু ছড়িয়ে আছে বলেই না আমরা সুন্দরের রূপ বুঝতে পারি। ব্যাথা ভয় মৃত্যু আছে বলেই তো ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকা দরকার।

এসব কথা বলে ও আমার মনের সন্দেহ দূর করতে পারল না ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার যা বিশ্বাস তা নড়াতে পারল না।

আমরা দুজনে যে যার বিশ্বাস নিয়েই রইলাম।

আমি তখন বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করছি। আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এক রহস্যময় জগতের দরজা। আলোক বৎসর কি, নেবুলা, গ্যালাক্সি কি? আমাদের সূর্যের থেকেও হাজার হাজার গুণ বড় বহু নক্ষত্র ভেসে বেড়াচ্ছে মহাশূন্যে। সেইসব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে কতগুলো পৃথিবীতে দিন রাত হচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে বুঝেছি, মহাবিশ্বের সাথে আমি কত তুচ্ছ। যেন একটা ধূলোকণা! আর এই পৃথিবীটাও মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার কোটি ছোট বড় নুড়ি পাথরের মধ্যে সব থেকে ছোট্ট একটা নুড়ি।

এত জানার পর ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তা যেন আরও গভীর হল। মনে হল, এক ঈশ্বর এত বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিষয়ের উপরে কি করে তার নজর রাখবেন? তিনি থেকেও তাই নেই।

এই সব চিন্তা থেকে অমৃতা ভাবনা এল। মহা ব্রহ্মাণ্ডের বুকে আমি তুচ্ছ, আমার জীবন তুচ্ছ, আমার মতই আর সবার ও বাঁচা মরা যেন কিছুই না। একথাই ঠিক।

তবুও আমাদের বাঁচতে হবে একটা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রতিটি

মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে ভাল কিছু করতে হবে ।

কতদিন স্টুটগার্টের পথে বেড়াতে বেড়াতে আমরা ছুজনে এইসব আলোচনার ভ্রম্য হয়ে যেতাম । তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে, বেটেনগেন্স্ আর আলডেবারানের চূড়ার বরফ যেন ঝিকমিকে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসত । মনে হত যেন কত আলোক বৎসরই না পার হয়ে আসছে ওদের ওই হাসি !

শুধু এই সব নিয়েই আমরা আলোচনা করতাম যে তা নয় । তবে সে সময় অন্য ছেলেরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত, আমাদের বিষয় বস্তু নিশ্চয়ই ছিল তার থেকে ভিন্ন ।

মেয়েদের বিষয়েও আমরা যে আলোচনা করতাম না তা নয় । তবে তা হত নেহাতই সাদাসিধে

আমার সাথে তেমন কারও ভাব ছিল না । আত্মীয়দের মধ্যে নেহাতই ছেলেমানুষ ছুজন খুড়তুতো বোন ছিল । ছুজনেই বেজায় বোকা, আর দেখতেও তেমন আহামরি গোছের ছিল না । একজন তো সারাক্ষণই মুখে চকলেট চুষাতা, অন্য জনের কেন যেন আমার সামনে মুখে কথা বার হত না ।

ধোন্‌রাডিন এদিক থেকে বেশী ভাগ্যবান । অন্তত ওর বান্ধবীদের নামের বাহার ছিল । গ্রাফিন, ব্যরনেস ফন হেনশেল, ডোনাসমার্ক, আর সোয়ামো ডে মন্টমোরেগ্নি, সে নাকি একবার স্বপ্নেও ওকে দেখা দিয়েছিল !

স্কুলের অন্য ছেলেরা কে কি করত জানি না । আমরা কিন্তু ছুজনে ছুজনকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম । মুখে অন্তরা যতই বড়াই করুক না কেন, এখন মনে হয়, তারা আসলে মেয়েদের সম্বন্ধে ভীষণ ভীতুই ছিল ।

এত কথা আমি বলছি শুধু আমাদের ছুজনের তখনকার মনের সঠিক পরিচয় দেবার জন্য ।

সুখ দুঃখ, হাসি কান্নায় ভরা আমাদের এক নিজস্ব জগতের মাঝেই আমরা যেন পরস্পরকে গভীরভাবে চিনেছিলাম । আমাদের ব্যক্তি-গত সমস্যা, তা সে যাই হোক না কেন, তা নিয়ে আমরা কখনও



আমাদের বাবা মাঝে বিভ্রত করতাম না। ভাবতাম তাঁরাও যেন অণু কোনও অচেনা জগতের মানুষ! নিজেদের মধ্যে তাই বাবা মাঝে নিয়ে কখনও আলোচনা করতাম না। খোন্‌রাডিন জানত আমার বাবা ডাক্তার। আমিও জানতাম ওর বাবা টার্কি আর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ব্যাস, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জানা ঐ পর্যন্তই। হয়ত এরই জন্তু আমরা কেউই কখনও কারও বাড়িতে যাইনি।

ছুটির পর পথে পাইচারি করতাম আমরা। তখনই আমাদের আলোচনা চলত সব বিষয়ে। কখনও গিয়ে বসতাম কোনও পার্কের বেঞ্চে। বৃষ্টি নামলে কারও বাড়ির বারান্দার তলায় আশ্রয় নিতাম।

একদিন, কথা বলতে বলতে আমরা আমাদের বাড়ি দরজা পর্যন্ত এসেছি। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ আমার মনে হল, খোন্‌রাডিন তো কখনও আমার ঘরে যায়নি। আমার বই পত্র সত্বে জিনিস কিছুই দেখেনি। কি যে হল হঠাৎ জানি না, আমি ওকে ডেকে বসলাম,—এসো না আমার ঘরে।

ও একটু ইতস্তত করল। আমি যে ওকে এমনভাবে হঠাৎ ডেকে বসব, তা ও ভাবেনি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ও এল আমার সাথে।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.org

আমাদের বাড়িটা নেহাতই সাদামাটা। স্থানীয় পাথরে তৈরি।  
চেরি আর আপেল গাছে ভরা এক বাগানের প্রায় মাঝখানে।

স্টুটগার্ট সहर ছ'ধার চাপা এক পাহাড়ি উপত্যকার মাঝে হওয়ার  
জন্য চারপাশ টিলা আর আগুর ক্ষেতে ঘেরা। সোজা লম্বা রাস্তা তাই  
সহরে তত নেই। বড় রাস্তা খ্যোনিগ্ স্ট্রাসে থেকে এদিক ওদিক যত  
রাস্তা বার হয়েছে তার সবই কিছুটা সমতলে সোজা গিয়ে পাহাড়  
চড়তে আরম্ভ করেছে। উচু টিলার গায়ে থাকে থাকে সারি সারি  
বাড়ি। টিলার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে নানান ধরনের  
বাড়ির সারি নজরে পড়বে। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, ময়দান বা  
বাগান, গরমের বিকালে লোকেরা সেখানে জটলা করে। নানান  
মুখরোচক খাবার খায়। সেখান থেকে চারপাশে তাকালে সবুজের  
সমারোহ নজরে পড়বে। লরেল, পপুলারের সারি দূর দিগন্ত পর্যন্ত  
ছড়ান। তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে নেক্কার। পাশে ফেলে পুরনো  
দিনের ছুর্গ, দেহাতি সहर আর পপুলারের সার। কোথাও বয়ে  
চলেছে খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেষে, আগুর ক্ষেত পাশে ফেলে সোজা  
উত্তর সাগরে।

যখন রাত নামে, হাজার আলোর মালা পড়ে সুর। টিলায় টিলায়,  
পাহাড়ের ঢালে ঢালে সে আলোর মালা ঝাঁপে। গ্রীষ্মের বাতাসে  
জুঁই আর লিলাকের গন্ধ ম' ম' করে। বাতাসে ভেসে আসে টুকরো  
টুকরো হাসি আর গানের সুর। তারপর আস্তে আস্তে ঘুম নেমে  
আসে সারা সহরের বুকে।

নীচে সহরের পথগুলো নানা বিখ্যাত লোকের নামের স্মৃতি বয়ে  
চলেছে—হোল্ডারলিন, শিলার, ম্যোরিক্কে, উলাও, হিলাও,  
হেগেল, শেলিং, আরও কত নাম।

ভুরট্রেনবার্গের স্টুটগার্ট অঞ্চলে বাস করেনি যারা তাদের জীবন  
বৃথা, এ কথাটা এদিকের লোকের মুখে মুখে ফেরে। কথাটা খুব ভুল

নয়। মাত্র পাঁচ লক্ষ লোকের বাস এ সহরে, তবু এ সহরের মত এত ভাল অপেরা হাউস, থিয়েটার, মিউজিয়াম বা এ ধরনের অল্প আর সব প্রতিষ্ঠান আর কোথাও নেই। ম্যাক্সেস্টার, বামিংহাম, বোর্দো, বা তুলোর নাগরিকদের জীবন ধারার চেয়ে এ সহরের নাগরিকদের জীবনধারা অনেক বেশী আনন্দের। এ যেন রাজাহীন এক রাজধানী। চারপাশে দূরে কাছে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট সুন্দর দেহাতি গ্রাম সহর, পুরনো দিনের দুর্গ, গীর্জা যেমন খানসৌশি ও মনরেন্স। কাছেই ব্র্যাক ফরেস্ট। তাছাড়া আমাদের সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তো তুলনাই হয় না।

আমাদের বাড়িটা উঁচুতে। সেখান থেকে নীচে দেখা যায় বড়-লোকদের বড় বড় বাড়ির সারি। সবগুলোই বাগান দিয়ে ঘেরা, চক-মেলান। কোন সন্দেহ নেই যে ওদের আর্থিক অবস্থা আমাদের থেকে অনেক অনেক ভাল।

বাবা কিন্তু বিশ্বাস করতেন ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা আরও ভাল হবে। তবে তার আগে যা আছে, তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের।

আমাদের চার কামরার বাড়িটার মাঝখানে ছিল খাবারঘর। বাড়ির লাগোয়া একটুকরো বাগান। ঘর গরম করার ব্যাপারটা ছিল মাঝখানে এক জায়গায়। ঘরের একটায় ছিল বাবার চেয়ার। সেখানেই তিনি রুগীদের দেখতেন।

দোতলার একপাশে ছিল আমার ঘর। সাজিয়ে ছিলাম একেবারে নিজের মন মত করে। একপাশের দেওয়ালে সিজানির বিখ্যাত ছবি 'দি বয় ইন এ রেড ওয়েস্টকোট' টানানো। তাকে রাখা কথানা জাপানি কাঠ খোদাই। অল্প দেওয়ালে টানানো ভ্যান র্যাগের 'সানফ্রাওয়ার'। সেল্ফে রাখা, শিলার, ক্রেস্ট, গ্যেটে, হোল্ডারলিনের সঙ্কে সেস্সপিয়ার, রিক্স, ডেহেমেল, বদলেয়ার, বালজাক, ফ্লেবোর, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, আর গোগোলের বই।

কোণায় কাচের ঢাকনাওয়ালা একটা বিশেষ টেবিলে রাখা আমার জমানো পুরানো দিনের টাকা পয়সা, নানান ধরনের পাখর, পলা

আর আগ্নেয় লাভা। এছাড়াও আছে সিংহের নখ, বাঘের খাবা, শীল মাছের চামড়া, হাতির কষের-দাঁত। রোমান যুগের একটা কোমড়বন্ধ, সে যুগের নক্সা কাটা ছোটো কাচের টুকরো। লোভ সামলাতে না পেরে ওহটো আমি স্থানীয় মিউজিয়াম থেকে হাত সাফাই করে এনেছিলাম। আর ছিল ছোটো রোমান যুগের টালি। তাতে খোদাই করা আছে, LEG. XI।

এসব নিয়েই ছিল আমার জগৎ। যেখানে আমি নিশ্চিত্তে আপন খুশিতে চলাফেরা করতে পারতাম, ভাবতাম, এই জীবনই বৃষ্টি চিরকালের।

কোন সুদূর অতীতে ইহুদীদের কোন পূর্বপুরুষ কোথা থেকে কোন পথ ধরে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, আজ আর কে জানে তার খবর। কে জানে, কোন পথ ধরেই বা তাঁরা গেছিলেন জেরুজালেমের দিকে। তাঁদের সমাধিগুলো যে কোথায় কোন পথের ধারে অবহেলায় ধুলো খুসর হচ্ছে তাও আর আজ কারও জানা নেই। শুধু জানি, প্রায় দুশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলে এসে বাসা বেধেছিলেন। সেও বোধ হয় ওই বিখ্যাত হোহেনফেল্‌স পরিবারদের ও অনেক আগে। সেই থেকে এই হল আমাদের দেশ, আমাদের পিতৃভূমি। এখানেই আমাদের বাড়ি। এখানেই এই মাটিতেই দুখুগ ধরে আমরা বড় হয়েছি। এটাই তো চিরকালের সত্য।

কার চুল ঘন কাল, কার চুল কটা, এসব কথায় আজ আর কি আসে যায়? হ্যাঁ, এ কথাও সত্যি আমরা ইহুদী। এও তো অস্বীকার করার মত কিছু নয়। এও তেমনি সত্যি, যেমন সত্যি আমরা আমাদের হেনরী কাকাকে গত দশ বছর দেখিনি। অথচ আমাদের পরিবারের তিনিও একজন।

বছরে একদিন, প্রায়শ্চিত্তের দিন আমার মা সিনাগগে যান প্রার্থনা করতে। সেদিন বাবা সিগারেট খান না। কোথাও বেড়াতেও যান না। এসব উনি করেন মনের কোনও কুসংস্কার থেকে নয়, করেন পরিবারের অপর বৃদ্ধদের মনে দুঃখ দেবেন না বলে।

একদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। আমাদের ধর্মের একজন প্রচারক এসেছিলেন বাবার কাছে ইজরেইলের জন্য টাকা তুলতে। বাবা ধর্মের গোড়ামি পছন্দ করতে পারতেন না, তাই ইজরেইলের পক্ষে প্রচারকের বলা কথাগুলো তিনি মানতে পারলেন না। প্রায় দুহাজার বছর বাদে আজ আবার প্যালেস্টাইনকে ইহুদীদের দেশ বলে দাবী করার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। এই তাঁর মত। এ মানলে তো ইটালিয়ানরাও আজ গোটা জার্মানীকে তাদের রাজ্য বলে দাবী করতে পারে। অতীতে রোমানরা ও ইহুদীরাও তো এদেশ দখল করেছিল এইসব ক্ষুদ্র চিন্তা। শুধুই যুদ্ধ বাধায়। ইহুদীদের গোটা আরব জাতির সাথে লড়তে হবে চিরকাল। আজ যারা মার খাচ্ছে, চিরকাল কি তারাই মার খাবে? তখন? তাছাড়াও জার্মানির স্টুটগার্টের বাসিন্দা হয়ে জেরুজালেম নিয়ে করার কি থাকতে পারে তাঁর?

প্রচারক হিটলারের কথা তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—এর পরেও কি আপনার মনে ভয় জাগেনি?

বাবা মাথা নেড়ে বললেন,—না, কেন ভয় পাব? আমি আমার দেশকে চিনি, চিনি দেশবাসীদের। এতো একটা সাময়িক অস্থিরতা, যা ছদিনেই কেটে যাবে। দেশের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হলেই সবাই ভুলে যাবে এ পাগলামি। গোটে শিক্ষিত আর বিটোভেনের দেশের লোকেরা কি ওইসব ছাই ভাস্মে বিশ্বাস করতে পারে? তাছাড়া কি করে আপনি ভুলে গেলেন সেই বাহুজার ইহুদী বীরদের কথা; যারা মহাযুদ্ধে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। অন্য আর কিছু চিন্তা করলে তো তাদের আত্মাকে অসম্মান করা হয়।

প্রচারক মশাই হতাশ হয়ে বলেছিলেন,—আপনি মশাই একজন শান্তিশিষ্ট নিবিবাদী মানুষ, নিজের ব্যক্তিসত্তাকেই বিক্রিয়ে দিয়ে বসে আছেন।

বাবা উত্তরে বলেছিলেন,—কতি কি যদি দেশের ইহুদীরা ওতপ্রোত ভাবে জার্মানদের সাথে মিশে যেতে পারে। তাহলেই তো স্থায়ী শান্তি আসবে। কিন্তু এ কি দেখছি! ইহুদীরা শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে

কৃষ্টিতে তাদের যথা সর্বস্ব নিঃশেষে দেশের জন্য দিয়েও কেমন যেন নিজেদের একপাশে সরিয়ে রেখেছে। এমনই তো চলেছে চিরকাল।

এসব কথা প্রচারক ভদ্রলোকের পক্ষে হজম করা শক্ত হল। তিনি নিজের কপালে টোকা মারতে মারতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিলেন,—নিজেকে মশাই বিকিয়ে দিয়েছেন, নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছেন।

প্রচার পত্রগুলো তুলে নিয়ে বড় বড় পায়ে তিনি সরে পড়েছিলেন।

বাবা ছিলেন শাস্ত্র মানুষ। তাঁকে কখনও কোন বিষয়ে তর্ক করতে দেখিনি। তাঁর কাছে ঐ প্রচারক ভদ্রলোক ছিলেন যেন এক দেশদ্রোহী, জার্মানীর শত্রু! যে দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছু-ছুবার তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন, প্রয়োজনে সে দেশের জন্য ওই বয়সে আবার ও তিনি লড়তে পারতেন।

বাবাকে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম। এই শতাব্দীতে তাঁর মত মানুষরাই শুধু ন্যায় আর অত্যাচারের মাঝে ভেদ বজায় রাখতে চাইতেন। ছুঃখ ও পেতেন তাই।

যে দেশের মানুষের চোখে রাইন, মোসেল নেকার আর মাইন নদীর স্বপ্ন, তারা কি করে জর্ডনের ঘোলাট জলে তৃপ্তি পাবে, এ কথাটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না।

তাঁর কাছে নাৎসীরা সমাজে একটা দুই কণ্ঠের বেশী আর কিছুই ছিল না, যা ঠিক মত ব্যবস্থা নিলেই সেরে যাবে। ও নিয়ে তাই বেশী চিন্তা করা অবাস্তব।

স্টুটগার্ট অঞ্চলের তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক, লক্ষপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার। জাতি ধর্ম নিবিশেষে সবাই তাঁকে ভালবাসে। ওঁর পঞ্চাশ বছর পুঁতি উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভায় সহরের মেয়র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রকাশ্যে ওর গুণ কীর্তন করেছেন। খবরের কাগজে খবরের সঙ্গে বাবার ছবিও ছাপা হয়েছিল। তাছাড়াও গর্ব করার মত আর অনেক কিছুই তাঁর ছিল বিছানার মাথার কাছে রাখা ছিল সেই গর্ব করার

মত পদক, যার নাম, আয়রণ ক্রশ, প্রথম শ্রেণী। আর দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখা তার অফিসারের তলোয়ারটা। একজন সৎ জার্মানের পক্ষে কি বেশী চাই ?

আমার মার কত কাজ। নাৎসী বা কমিউনিস্টদের নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় ছিল না তাঁর। বাবার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে তিনি একজন জার্মান। মা ও স্বপ্নে ভাবতে পারতেন না যে দেশের মাটিতে থাকার না থাকার প্রশ্নে কেউ কোনও দিন কথা তুলবে ! সবারই তো তার আপন দেশে বাঁচা মরার অধিকার আছে, তবে ?

হুইমবার্গের ওদিকে ছিল দাছদের দেশ। তিনি ছিলেন উকিল। মা তাই ওই অঞ্চলের মতই কথা বলতেন। সে অভ্যাস তিনি ছাড়তে পারেন নি।

সপ্তাহে একদিন আশপাশের গিন্নীবান্নিরা মজলিস বসাতেন। রাষ্ট্র-বাগ্না, ঘরকন্নার কথা, বাড়ির কাজের লোকদের নিয়ে আশোচনা এই সবই বেশী হত সেখানে। ডাক্তার, উকিল, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের স্ত্রীরাই মিলতেন সেখানে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে চলত এটা ওটা খাওয়া।

দু'সপ্তাহে একবার অপেরা দেখতে যেতেন মা। মাসে একবার থিয়েটার। এত সব করে ওঁর আর বই পড়ার মত সময় থাকত না। তবে মাঝে মধ্যে আমার ঘরে এসে এ বই ও বই হাতে নিয়ে দেখতেন তিনি। খুলো ঝেড়ে সেগুলো আবার ঝুলিয়ে রাখতেন তাকে। কখনও জিজ্ঞাসা করতেন,—হ্যাঁরে থোকা তোর পড়াশুনা ঠিক মত হচ্ছে তো ?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমি বেশ গভীর ভাবেই দিতাম। বলতাম,—ঠিক আছে মা, ঠিক আছে, ওসব নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

উনি আমার কাঁধে তাঁর হাত রাখতেন। বুঝতাম, আমার অমন উত্তর তাঁকে ব্যথা দিয়েছে। তবুও কিছুই বলতেন না তিনি। ঘরের কোণায় রাখা ছেঁড়া মোজাগুলো তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চলে

ঘেঁতেন ।

যখন আমি রোগে ছটকট করতাম, তখন তিনি সারাক্ষণ আমার মাথার কাছে বসে থাকতেন । মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, এটা ওটা বলে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন । তখন, পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে আমি ছেড়ে দিতাম তাঁর হাতে ।

আমার বাবা মাকে দেখতে ছিল মুন্দর । উঁচু কপাল কটা চুল আর যত্নে ছাঁটা গোঁফে বাবাকে বেশ বনেদি দেখাত । কে বলবে তিনি ইহুদী । ট্রেনে একবার তো নাৎসী দলের একটা লোক ওঁকে নাৎসী পার্টিতে যোগ দেবার জন্তু অনুরোধ করেছিলেন ।

মা কখনও খুব সাজগোজ পছন্দ করতেন না । তবুও তাকে দেখাত মুন্দর । অন্তত আমার চোখে তো তাই ।

আমার বয়স যখন ছয় কি সাত, এক রাতে মা এলেন আমার ঘরে আমাকে আদর করতে, কোথায় নাচের পার্টিতে যাচ্ছিলেন তিনি তাই খুব সজেে ছিলেন । আমি তো হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম । কাছে আসতেই হাত দিয়ে ঘরে ফেললাম । আদর করতেই কান্না শুরু করলাম । তিনি তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, হঠাৎ হল কি আমার ! অশ্রু বিস্মৃত নাকি ?

তিনি বুঝবেন কি করে কেন কেঁদেছিলাম আমি সেই তো প্রথম আমি জানতে পেরেছিলাম, আমার মা কত মুন্দর ।

খোন্‌রাডিন কে সোজা নিয়ে যেতে চাইলাম দৌতলার ঘরে । মার কাছে গেলাম না প্রথমে । কেন যে অমন আমি করতে চাইলাম জানি না । আজ কিন্তু ভাবতে বসলে বুঝি, অমন করেছিলাম, কারণ আমি ভাবতাম, ও শুধু আমারই বন্ধু আর কারও কিছুই নয় । সে কথা ভাবলে এখন হাসি পায় । তাছাড়া মনে তখন এ চিন্তাও ছিল, আমার বাবা মা তো তেমন কেউকেটা নন, যাদের সাথে ওদের মত উঁচু বংশের ছেলের আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় । আমার বাবা মাকে আমি ভালবাসতে পারি । তাদের নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারি, কিন্তু



তাতে অশ্রুদের কি আসে যায় ?

তখনি মনে হয়েছিল, এসব আমি কি ভাবছি ! এত নীচ হতে পারলাম আমি ! এমন তো হলো আমি আমার এই বন্ধুর কথা ভেবেই, কেন আমি ওর জন্য এমন হব ? হঠাৎ ওরই উপরে আমার ভীষণ রাগ হল । কি যে করব ভাবছি, তখনি মা আমার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমাকে ডাকলেন ।

বাধ্য হয়ে মার সাথে আমি ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম তারপর ওকে আমি আমাদের বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালাম । বসার ঘরে কার্পেট পাতা, ওক কাঠের আসবাব দিয়ে সাজান । আলমারিতে নক্সাকাটা কাচের বাসন । আমি ওকে এসব যখন দেখাচ্ছিলাম, মা তখন পিছনের বাগানে একটা রবার গাছের ছায়ায় বসে মোজা সারাচ্ছিলেন । আমার বন্ধুকে দেখে উনি মোটেও অবাক হলেন না । পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে যখন বললাম,—মা আমার বন্ধু খোন্‌রাডিন, হোহেনফেলস্ বাড়ির ছেলে । উনি হেসে ওর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । সব মায়েরা যেমন বলেন, তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—পড়াশুনা কেমন হচ্ছে বাবা । বড় হলে কি হবে ? তারপর বলেছিলেন,—তুমি এসেছো বাবা, আমি খুব খুশি হয়েছি ।

মার কাছে আমি এমন ব্যবহারই চেয়েছিলাম । বুঝলাম খোন্‌রাডিন ও খুশি হয়েছে ।

তারপর ওকে আমি আমার ঘরে নিয়ে গেলাম । ওর সামনে আমার জমান যা কিছু সব খুলে দিলাম । বই পত্র, পুরনো টাকা পয়সা, সব কিছু ।

হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ পেলাম । তিনি ঘরে ঢুকলেন । এমন কাজ তো তিনি কখনও করেন না ! আমি কিছু বলার আগেই তিনি গোড়ালি ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন । ডান হাত খোন্‌রাডিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আমি ডাক্তার সোয়ার্জ ।

খোন্‌রাডিন ওর হাত ধরে ঝাঁকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না বাবা বললেন,—আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, এতো আমি ভাবতেই পারছি না । এ অতি সৌভাগ্যের কথা । কি উঁচু বংশই না



আপনাদের। হ্যাঁ, আপনার বাবার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি আমার, তবে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধবেই আমি চিনি। ব্যারণ কন ক্রুমফের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয়। গত বিশ্বযুদ্ধে উলান রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দলটাকে তো তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। তাছাড়া হসার বাহিনীর দ্রিটার ফন ট্রোমপেডা আর পুটসি ফন গ্রীমমেল মানসেল, যাকে সবাই বাউটজ্ বলে ডাকত, তাঁদের ও চিনি।

বাউটজ্ আবার যুবরাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সম্রাটের প্রধান দপ্তর তখন সারলেরইতে। একদিন তিনি বাউটজ্কে ডেকে বললেন, বন্ধু একটা উপকার করতে পারেন? আমার পোষা সিম্পাঞ্জি গ্রেটেল, বেচারী সঙ্গী ছাড়া সারাক্ষণ মন মরা হয়ে থাকে। ওর বিয়ে দিতে চাই, একটা বর খুঁজে দিতে পারেন? গাড়ি নিন, সারা জার্মানি চষে ফেলুন, দেখুন উপযুক্ত বর খুঁজে পান কিনা? আমি এ বিয়েতে দফতরের সবাইকে নিমন্ত্রণ দেব,—এ গল্প বাউটজ্-ই আমাকে বলেন। বাউটজ্ তো গোড়ালি ঠুঁকে সেলাম বাজিয়ে সিঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, যো হুকুম মহামান্য সম্রাট।

তারপর ডিমলার চড়ে চিড়িয়াখানা থেকে চিড়িয়াখানা ফিরতে লাগলেন। দিন পনের পরে ফিরলেন এক গাট্টাগাট্টা সিম্পাঞ্জি নিয়ে, নাম তার পঞ্চম জর্জ! ধুনধাম করে বিয়ে দেওয়া হল, খানাপিনা চলল। আর বাউটজ্ পেলেন প্রমোশন। ওর সম্বন্ধে আর একটা গল্প আছে, শুনুন, একদিন তিনি হাউসট্যান ব্রানডকের পাশে বসে আছেন, সে লোকটি আবার জীবন বাবার দালাল, তার উপরে ছিলেন ...ওহোঃ, বাইরের ঘরে আমার জন্ম রুগীরা অপেক্ষা করছেন।

তাড়াতাড়ি আবার উনি গোড়ালি ঠুঁকে সোজা হয়ে বললেন,—আশাকরি এ বাড়িকেও ভবিষ্যতে আপনি নিজের বলে মনে করবেন। আপনার বাবাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। আচ্ছা এখন আমি চলি।

যাবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কত খুশি হয়েছেন। তারপর বার হয়ে গেলেন।

দুঃখে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা হল আমার । কেন এমন করলেন তিনি ? এমন তো তিনি কখনো করেন না । ওই সব লোকদের নাম তো আমি আগে কখনও শুঁওঁর মুখে শুনিনি । তাছাড়া সিম্পাজির ওই বাজ্রে গল্পটাই বা বলতে গেলেন কেন ? এইসব বিদম্বুটে গল্প বলেই কি তিনি নিজেকে খোনরাডিনের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ? অত বড় বংশের নামের মোহ কি ওঁকে হঠাৎ পেয়ে বসেছিল ? যেমন আমাকেও পেয়ে বসেছে । সব থেকে বিশ্রী ওঁর ওই গোড়ালি ঠুঁকে দাঁড়ানটা । সামান্য একজন ছাত্রের সামনে কেন উনি এমন করতে গেলেন ?

আবার আমার মনে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা এল, এসবই তো ঘটছে খোনরাডিনের জগত্ই । ওর উপস্থিতিটাই তো বাবাকে এমন করে তুলল । যে বাবাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি, তিনিই কিনা শেষ পর্যন্ত এমন ছেলেমানুষি করলেন ! আমি ভাবতাম বাবার কত গুণ, যার কিছুই আমার নেই । তাঁর মত সাহস আমার নেই, মাথাও অত পরিষ্কার নয় । কত সহজেই না তিনি সবার সাথে বন্ধুত্ব পাভাতে পারেন । সব কাজই কি অনায়াসেই না করেন । আর তিনিই কিনা... ।

আমার ব্যাপারে উনি এমন ভাব দেখাতেন, যেন এড়িয়ে চলছেন । আমি তো জানি মনে মনে উনি আমাকে নিয়ে গর্ব করেন ।

কিন্তু আজ তিনি একি করলেন । ওঁর যে ছবি আমি মনে মনে কল্পনায় এত দিন ধরে এঁকে ছিলাম, সে যে মুছে গেল ! যাক, কিন্তু কি ভাবল খোনরাডিন । কোথায় সেই সম্মান শ্রদ্ধা দেখাবে বড়কে, তা না গোড়ালি ঠোকা, গদ গদ ভাবে আক্ষে আপনি বগা...সব কিছু মিলে একি হয়ে গেল !

লজ্জায় দুঃখে আমার চোখ কেটে জল এস । বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম । বার বার মনে একটা প্রার্থনাই করতে লাগলাম, আর যেন কোন দিনও খোনরাডিনের সাথে আমার দেখা না হয় ।

ও বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল । যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে আমার বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল ।

ও যদি তা না করত, যদি আমার সাথে কথা বলতে যেত, বা আমাকে  
সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত, আমি ওকে মেরেই বসতাম। ওর জন্মেই  
তো আমার ভালমাসুখ বাবা অমন করে নিজেকে অত ছোট করলেন।  
এ যেন প্রমাণ হয়ে গেল আমিও বড়লোকদের পোঁ ধরা।

নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া করে নেবার মত অনেকক্ষণ সময় দিল  
আমাকেও। তারপর ফিরে তাকিয়ে হাসল। ওর মুখে ওই হাসি দেখে,  
চোখের জলের মাঝেই আমিও হাসলাম।

দিন দুই পরে ও আবার এল। নিজেই ভারী কোটটা খুলে হল ঘরের  
আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। সোজা চলে গেল শোবার ঘরে মার কাছে।  
এমন ভাবে এসব করল ও, যেন বহুদিন ধরেই ওর এ বাড়িতে আসা  
যাওয়া।

মা কি যেন হাতের কাছে ব্যস্ত ছিলেন। কাজ থেকে চোখ না তুলেই  
ওকে ডেকে বসালেন। যেন ও ঘরের ছেলে। নানান কথা বললেন।  
অনেক পরে আমরা যখন ঘরে বসে কথা বলছি, উনি কফি আর কেক  
দিয়ে গেলেন।

এরপর থেকে সপ্তাহে অন্তত তিন চারবার করে ও আমাদের বাড়িতে  
আসত। ঠিক ঘরের ছেলের মতই সহজ সরল ব্যবহার করত। বেশ  
বুঝতে পারতাম, আমাদের বাড়িতে ও নিজেকে বেশ মানিয়েই  
নিয়েছে।

আমি শুধু ভয়ে থাকতাম, বাবা আবার না জির সেই মহান বীরপুরুষ  
বাউটজের গল্প শুরু করেন। তবে, সে সব আর তিনি করেন নি।  
ক্রমে তিনিও খোনরাডিন্কে বাড়িরই একজন বলে মেনে নিয়েছিলেন।  
শেষ পর্যন্ত উনিও ওকে নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন।

ও তো আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা আরম্ভ করল। আমি  
ভেবেছিলাম, এবারে আমাকেও ও ওদের বাড়িতে যেতে বলবে।

কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল তেমন কিছুই ঘটল না। কত দিন  
কথা বলতে বলতে আমরা ওদের বাড়ি পর্যন্ত গেছি, লোহার বিশাল  
জাক্রি কাটা ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছি, ফটকে ঈগল পাখির নক্সা

করা ওদের বংশের প্রতীক চিহ্ন সাটা। কথার শেষে ও বিদায় নিয়ে কটক ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেছে। কতদিন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একে দেখেছি, ভেবেছি, হয়ত আবার ফটক খুলে যাবে মস্ত্রে, ও আমাকে ডাকবে ভিতরে যাবার জন্য। —তেমন কিছুই হয়নি! কটকের ঈগল পাখির নক্সাটা ভীষণ ভাবে তাকিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়েছে। বাঁকা ঠোট আর ধারাল নখ দিয়েও যেন আমাকে ছিঁড়ে থাকবে। আমার মন ব্যাথায় ভরে গিয়েছে। ফটকটা খোলেনি। প্রত্যেক দিন কি যেন ব্যাথায় মাথা নীচু করে আমি ওর বাড়ির সামনে থেকে ফিরে এসেছি। মনে হয়েছে, ওই বাড়ির ভিতরে কি যেন রহস্য লুকিয়ে আছে। যা ভেদ করতে পারলেই আমাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হবে।

মনে মনে আমি ও বাড়ি সম্বন্ধে নানান কথা ভাবতে আরম্ভ করলাম। বিখ্যাত সৈনিক বংশের বহু বীরের বাস ছিল ওই বাড়িতে। তাহলে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় করে আনা বিপক্ষের অনেক পতাকা, নিশান, ঢাল, তলোয়ার, অশ্ব অন্ত্রশস্ত্র, লোহার জালি পোষাক, শিরস্ত্রাণ, এই সব দিয়ে সাজান ও বাড়ি। নিশ্চয়ই ওখানে গেলে ক্রুশাডে ব্যবহার করা অন্ত্রশস্ত্রও দেখতে পাব। হয়ত দেখতে পাব ইসপাহান, তেহেরান, সমরকন্দ বা বাইজ্যানটাইনের রেশমী পোষাক। আরও না জানি কত কি!

কিন্তু না জানা যে বাধা আমাকে ওই দিক কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তা যেন আর যাবার নয়। কিন্তু কি সেই বাধা, কেন সেই বাধা, সে বাধা থাকবে কেন, তা আর আমি বুঝতে পারতাম না।

ও খুব সময়ে বুঝে চলত, যাতে আমি ব্যাথা না পাই, রাগ না করি। কি আমি পছন্দ করি না, তা যেন ও বুঝেই নিয়েছিল। কি আমার মনের ইচ্ছা তাও ওর জানা হয়ে গেছিল, অথচ ওর বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ও একেবারে এড়িয়ে চলত।

আমার মনে ব্যাথা জমা হতে লাগল। বার বার মনে হতে লাগল, এমন বাধা কেন থাকবে আমাদের মাঝে? যে করেই হোক এ বাধা আমাকে সর করতেই হবে। ওর উপেক্ষা আমার মনে ওদের বাড়ি সম্বন্ধে যে

কি কৌতূহলই জাগিয়েছিল তার কথা তো ও জানত না।

একদিন ঠিক আগের মতই আমরা ওদের বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, ছাড়াছাড়ি হবে আমাদের, হঠাৎ ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, —তুমি তো কখনও আমাদের বাড়িতে আসনি? এস না, ভিতরে এস। আমার জমান জিনিসগুলো দেখে যাও।

অবাক আমি কোন উত্তর দেবার আগেই ও বিশাল ফটকটা খুলে ফেলল। আমার মনে হল, ফটকের ঈগল পাখির নক্সাটা আজও মুখ ভেংচাল কিন্তু বড় অসহায়! আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

আমার বেশ ভয় ভয় করছিল কেন যেন। আমি তো এর জন্ম তৈরী ছিলাম না। এতদিনের স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তবে রূপ নিল আজ, ছুটে পলাতে ইচ্ছা করছিল আমার। কি করে ওর বাবা মার সামনে দাঁড়াব আমি? আমার জুতো নোংরা, জামার কলার ও বোধ হয় অপরিষ্কার। আর টাইটাও মনে হয় তেলচিটে পাক ধরা।

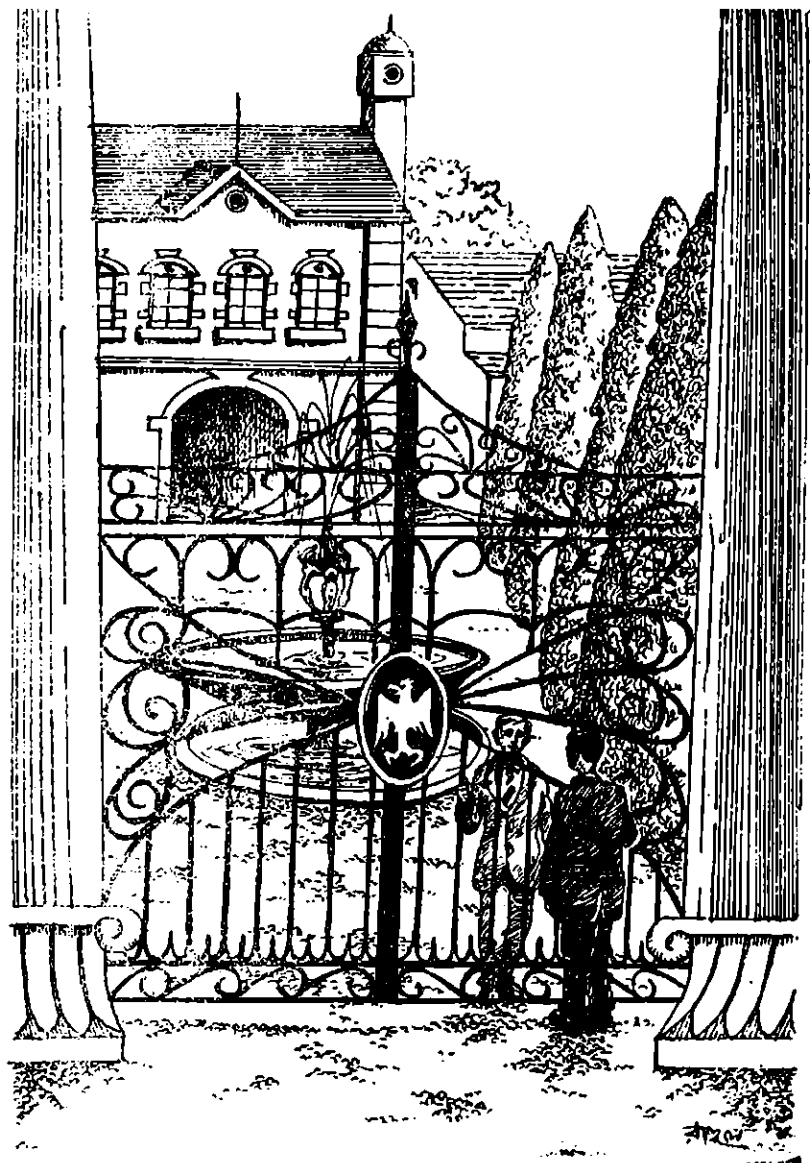
ওর মাকে তো একদিন দূর থেকে দেখেছি আমি। আমার মার মত শুভ কর্মী নন তিনি। সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাগনোলিয়া গাছটার সামনে। হাতে খোলা ছাতা, দারুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে + আমি ওর সামনে গিয়ে কি করব, কি বলব?

দারুণ চিন্তা নিয়েই ভয়ে ভয়ে আমি চললাম ওর পিছনে পিছনে। ফটক পার হয়ে বাগানের পথ পেরিয়ে আমরা বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। ও আস্তে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে গেল ওকে আর আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেবার জন্ম।

ভিতরে ঢুকে মনে হল, আবছা অন্ধকারের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকার সয়ে যেতে দেখলাম। বিশাল এক ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকের দেওয়ালে উঁচুতে টাল্পান নানান জন্তুর মাথা, হাতির দাঁত। নীচে একদিকে রূপো দিয়ে বাঁধানো ছোটো হাতির পারে ছাতা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি কোট খুলে আলনায় ঝোললাম। বই খাতার ব্যাগটা পাশের একটা চেয়ারে রাখলাম।

একজন কাজের লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কফি দেবে কিনা? মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল খোনরাডিন।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG





কাঠের বড় একটা সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। সামনের বারান্দার ছপাশে ওক কাঠের ভারী দরজাগুলো প্রায় সবই বন্ধ ছিল। কাঁকে কাঁকে দেওয়ালে টাঙ্গান নানান জন্তু জানোয়ারের ছবি। তারই মাঝে এক পাশে একটা রোন হুর্গের ছবি। আর এক দিকে মৃত এক সস্ত্রাটের ছবি টাঙ্গান।

বারান্দাটা পার হয়ে আমরা অন্য সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠলাম। এখানে বারান্দায় অনেক বেশী ছবি টাঙ্গান। নানান ধরনের ছবি। বারান্দার কয়েকটা দরজা খোলা, একটার ভিতরে নজর যেতেই মনে হল, কোন মহিলার শোবার ঘর। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনের সরঞ্জাম সাজান। এ ঘরের দেওয়ালেও রূপালি ফ্রেমে বাধান আপন জনদের ছবি টাঙ্গান। কিন্তু একটা যেন মনে হল ঠিক হিটলারের মতই দেখতে! ঠিক দেখলাম তো? কে জানে! দাঁড়িয়ে যে ঠিক করে দেখব তার উপায় ছিল না, চলতে চলতে এক নজরেই দেখা। আমি কিন্তু ভীষণ মর্মাহত হলাম, এত বড় পরিবারের শোবার ঘরেও হিটলারের ছবি!

শেষ পর্যন্ত খোনরাডিনের ঘরে পৌঁছালাম। ঘরটা আমারই মতন, তবে একটু বড়। সামনে জানালার নীচেই চমৎকার বাগান, সেখানে ফোঁড়ারা। এক পাশে গ্রীক ঢঙ্গে তৈরী একটা ছোট মন্দির, পাশে এক দেবী মূর্তি, হলুদ স্তাওলায় ঢাকা।

ওসব দেখার সময় ছিল না। খোনরাডিন ভীষণ আগ্রহ আর উৎসাহে খুলে বসল ওর যা কিছু জমান জিনিস। তুলোর বাস্র থেকে বার করল পুরোন দিনের টাকা পয়সাগুলো। বার করল করিহের এক পক্ষিরাজ মার্কা মুদ্রা। শুধু তাই নয়, এক এক করে এমন সব জিনিস ও বার করতে লাগল যা যোগাড় করা আমার সাধের বাইরে। সব কিছু দেখে আমি তো থ' মেরে গেলাম। ভালও লাগল খুব। আমাকে খুশি করতে পেরে ওর কি আনন্দ!

কোথা দিয়ে ছ' ছোটো ঘটা কেটে গেল। যখন আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম, ওর বাবা মার কথা আর আমার মনেই ছিল না। জানিনা আমরা বাড়িতেই ছিলাম কি না।

দিন পনের পরে ও আবার আমাকে ডাকল। তেমনি খুশী ভরা মন নিয়ে আমি গেলাম ওর বাড়িতে, দেখলাম অনেক কিছু, কথা বললাম। আবার ও মনে হল ওর বাবা, মা বোধহয় কেউ বাড়িতে নেই। তাতে কি, এতো ভালই হল, ভাবলাম। আসলে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার চিন্তায় বেশ ভয়ই ধরে যায় আমার মনে।

কিন্তু বারবার একই ব্যাপার ঘটতে লাগল। কেন যেন মনে হল, আমি যা ভাবছি তা নয়। ও হয়ত আমাকে ডাকে, যখন ওর বাবা মা বাড়িতে থাকেন না। এই চিন্তায় কেন যেন বেশ ছুখ পেলাম মনে। তবুও এনিয়ে ওকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলাম না।

একদিন হঠাৎ আবার শোবার ঘরের সেই ছবিটা দেখলাম। সেই ছবিটা, ওটা কি হিটলারের! ঋমকে গেলাম আমি, ব্যথা পেলাম। স্বপ্নে ও তো ভাবিনি আমার বন্ধুর বাবা মার সাথ অমন একজন লোকের কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে!

এমন একটা দিন এল শেষে, মনে যখন আর কোনই সন্দেহ রইল না।

মা আমাকে এক বিখ্যাত অপেরার টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। পিছনের সারিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম পক্ষী ওঠার জন্য। বাজনাদাররা বাজনায় টুংটাং শব্দ তুলছিল। দর্শকরা ভীড় করে আসছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও এসেছেন দেখতে। সামনে তাঁকে ঘিরে গন্যমান্যদের ভীড়। তিনি বসে ছিলেন তাঁর জায়গায়। সাধারণের অবশ্য সেদিকে তেমন নজর ছিল না।

হঠাৎ সবার নজর পড়ল সামনের দরজার দিকে। দরজা দিয়ে রাজসিক কায়দায় ঢুকলেন হোহেনফেলসরা।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আমি থ। তাকে যেন আর আঁজ চেনাই যাচ্ছে না। রাতের ভোজ সভার পোষাক পড়ে এসেছে ও। সামনে ওর মা, দামী গহনায় সাজা। বাবার জামার বুকে হাঁরার তৈরী একটা

ভারা আটকান ।

ভারিচ্ছি চালে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা । সবাই যে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখবে এ ও যেন তাঁদের জানা । একষুগ ধরে তো এই পরিবারের নাম এদিকে সবার মুখে মুখে ফেরে ! এগিয়ে গেলেন ওঁরা ওদের সিটের দিকে । চলার তালে খোনরাডিনের মার জড়োয়া গহনায় আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছিল ! বসার আগে খোনরাডিনও তার বাবার মত চার-পাশে তাকিয়ে দেখে পরিচিতদের উদ্দেশ্যে মাথা ঝোঁকাল । তখনি হঠাৎ ওর নজর পড়ল আমার উপরে । সে কিন্তু এক লহমার জন্ত । ও চোখ ফিরিয়ে নিল ।

এদিকে ওদিকে অন্য পরিচিতদের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়ল ও ।

আমি জানি ও আমাকে দেখেছে, ওর দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্ত সে ছায়া পড়েছে, ও দেখেছে আমাকে । কিন্তু এ ও কি করল ? অমন করে ও না দেখার ভান করল কেন ?

তখনি অন্ধকার হয়ে পর্দা উঠল । সব কিছু ভুলে আমরা যেন এক অন্ধ জগতে চলে গেলাম । প্রথম অন্ধের শেষে পর্দা পড়ে আলো জ্বলে উঠতেই আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম । ভিতরে তখনও হাততালি থামেনি ।

মার্বেলের বড় বড় থাম দিয়ে ঘেরা বাইরের বসন্ত জায়গাটা । মাথার খাড় লণ্ঠন ঝুলছে, দেওয়ালে সোনালী ফ্রেস্কো আঁটা বিশাল আয়না দামি কার্পেট পাতা ঘরে ।

একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম আমি । ভাবখানা, আমিও বা কম কিসে । এমন করলাম আমি ওদের কথা ভেবেই ।

কিন্তু যেই দরজায় ওদের দেখা গেল, মনে হল পালাই । আমি যে ইহুদী তা তো আমি জানি । জানিনা কি চোখে দেখবেন ওরা আমাকে । মিথ্যা কেন তবে অপমানিত হই । কিছু ঘটলে, সে ব্যাখ্যা তো আমি সহিতে পারব না ।

তার থেকে থাক না আমাদের বন্ধুত্ব যেমন আছে । ওর বাবা মার অজ্ঞানতে গোপনে ।



চলে যেতে পারলাম না আমি। কেন তাও জানি না। তবে কি আজ একটা বিষয়ে হেতুনেত্ব করতে চাই আমি? চাই প্রমাণ, কি আছে ওর বাবা মার মনে? যে সন্দেহ আমার মনকে সারাক্ষণ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, তার হাত থেকে আজ মুক্তি চাই আমি!

কিন্তু কি হবে সেই প্রমাণে, যা আমাদের বন্ধুত্বকে শেষ করে দেবে। ব্যথায় দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। কেমন যেন বিস্ত্রী লাগতে লাগল। জানি, কিছুক্ষণ পরেই হয়ত সর্বনাশ ঘটবে।

আন্তে আন্তে তেমনি রাজসিক কায়দায় ওঁরা এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। পাশাপাশি হেঁটে আসছিলেন ওঁরা। এখানে ওখানে ধেমে, এর ওঁর সাথে ছুচারটে কথা বলছিলেন। প্রেসিডেন্টের সামনে এসে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানালেন। তিনিও তখুনি মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানালেন।

অন্য দর্শকরা ওঁদের পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। ওঁরা এগিয়ে চললেন। ক্রমে আমার খুবই কাছে এসে পড়লেন। কাছে, আরও কাছে, হঠাৎ আমাকে দেখতে পেল ও। একটু যেন হাসল, হাত তুলল এমনভাবে যেন কোটের কোনাটা ঝাড়ল। তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

থমকে গেলাম আমি। হুঃখ হল, রাগ হল, কান্না পেল আমার। মনে হল ওরা যেন কোন এক নাম না জানা রাজপুত্রের শত্রু যাত্রায় চলেছে পাত্রীদের মত। তেমনি মাঝে মাঝে হাত তুলে সম্মুখ থেকে যেন করুণা করছেন। ঘরের শেষে ওঁদের আর আঁখি দেখতে পেলাম না। সে শুধু অল্প কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার তেমনি ভাবেই ফিরে এলেন ওঁরা। তখন কিন্তু খোনরাডিন আর ওঁদের সঙ্গে নেই।

আবার ঘণ্টা বাজতেই আমি চলে এলাম। এলাম সোজা বাড়িতে। বাবা মার সাথে দেখা না করেই বিছানা নিলাম। রাতে ভাল ঘুম হল না। স্বপ্ন দেখলাম, ছোট্ট সিংহ আর একটা সিংহি আমাকে যেন আক্রমণ করতে আসছে! আমি বোধহয় ভয়ে চৌঁচিয়ে উঠেছিলাম। চোখ খুলে দেখি বাবা মা দুজনেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। বাবা থার্মোমিটার লাগালেন। না, কিছুই হয়নি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

পরদিন যথারীতি স্কুলে গেলাম। কিন্তু কেমন যেন দুর্বল বোধ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন বহুদিন ভুগে উঠেছি আমি।

খোনরাডিন তখনও আসেনি। আমি আমার জায়গায় বসলাম। খাতা খুলে হোম টাস্ক ঠিক করার ভান করলাম। ও যখন এল, দেখেও দেখলাম না।

প্রথম পিরিয়ড শুরুর ঘণ্টা পড়তেই ও এল। সোজা গিয়ে ওর জায়গায় বসল। বই খাতা গুছিয়ে সামনে রাখল। পেনসিলগুলো ঠিক আছে কিনা পরখ করতে লাগল। আর আমাকে না দেখার ভান করতে লাগল।

প্রথম পিরিয়ডের শেষ ঘণ্টা পড়তেই ও এল আমার কাছে। হঠাৎ ছহাত ওর রাখল আমার কাঁধে। অবাক হলাম আমি। এমন তো কখন ও করে না! তারপর নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল। কিন্তু ভুলেও জিজ্ঞাসা করল না, কালকের নাটক আমার কেমন লাগল!

আমিও ওর সব কথায় উত্তর দিলাম। নাটকের কথা তুললামই না। ছুটির পর দেখি ও অন্য দিনের মতই আমার জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। এক সাথেই ছুজনে ফিরে চললাম, যেন কিছুই হয়নি। অনেকক্ষণ আমি নিজেকে সামলে রাখলাম, বুঝতে পারছিলাম, আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা ও বুঝতে পারছে। পারছে বলেই ও যেন অন্য কথা বলে আসল ব্যাপরটাকে যতদূর সম্ভব দেরী করিয়ে দিচ্ছে। গত দিনের ঘটনা তো ভুলে যাবার নয়।

লোহার ফটকের সামনে ছাড়াছাড়ি করার মুখেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—খোনরাডিন কাল রাতে তুমি আমার সাথে অমন ব্যবহার করলে কেন?

এ কথাই যে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করব তা ও জানত। তবুও ব্যাথা পেল ও। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হয়ত মনে করেছিল, যাই হোক না কেন, লজ্জায় এসব কথা আমি আর তুলব না। কদিন অস্বস্তির পর ছুজনেই ভুলে যাব সব কিছু। তা নয়, মুখের উপরে এমন করে জিজ্ঞাসা করে বসব, তা যেন ওর ধারণার বাইরে।

কি যে উত্তর দেবে ও ভেবেই পেল না। অনেক কষ্টে এ কথা ও কথার

মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, আমার ধারণা ভুল। ও আমাকে এড়িয়ে চলেনি। আমি নাকি ভয়ানক ভাবপ্রবণ। আসলে ও ওর বাবা মাকে ছেড়ে আসতে পারছিল না।

ওসব কথায় কান দিলাম না আমি। বললাম,—দেখ ভাই তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি। তুমি কি মনে কর আমি বুঝি না, আমাকে তুমি তোমাদের বাড়িতে যেতে বল যখন তোমার বাবা মা থাকেন না, তখন। কালকের ঘটনা সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি সবই ভুল, একথা কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? আজ আমাকে জানতে হবে, আমি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। হাঁ এও ঠিক, আমি তোমাকে হারাতে চাই না। তোমার সাথে ভাব হবার আগে আমি তো একাই ছিলাম। কোন বন্ধু ছিল না আমার। তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও, আবার আমি একা হয়ে যাব। তা বলে আমার জন্য তুমি তোমার বাবা মার কাছে অপদস্থ হও তাও আমি চাই না।

আমি কি বলছি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তোমার বাবা মার সাথে পরিচিত হবার একটুও ইচ্ছা আমার নেই। তবে একদিন অন্তত অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেখা হওয়া দরকার, তাহলেই আমি বুঝতে পারব তোমাদের বাড়িতে আমি অবস্থিত কিনা। তেমন কিছু ঘটাব চাইতে, সারা জীবন আমি একাই থাকব। আমি যা, আমি তাই। কিসে আমি তোমাদের থেকে কম? স্পষ্ট বলে দিচ্ছি তোমাদের কেউ আমাকে জাত তুলে অপমান করলে আমি তা বরদাস্ত করব না। তা তিনি রাজা উজির যেই কোন না কেন।

ভীষণ রাগে কথাগুলো বললেও আমার হৃচোখ জলে ভরে গেল। আরও হয়ত অনেক কিছুই আমি বলতাম। বাধা দিয়ে খোনরাডিন বলল,—ভাই, তোমাকে অপদস্ত করার এতটুকু ইচ্ছাও আমার নেই। কেন আমি তা করব? তুমি তো জান তুমিই আমার এক মাত্র বন্ধু। তোমাকেই আমি সব থেকে পছন্দ করি। তোমার সাথে ভাব হবার আগে আমিও তো একা একা ঘুরে বেড়াতাম। তুমি চলে গেলে আমি আমার একমাত্র বন্ধুকেই হারাব। তোমার জন্য কেন আমি অপমান বোধ করব? এ কথা কি করে ভাবলে তুমি? স্কুলের সবাই তো জানে

আমাদের বন্ধুত্বের কথা। আমরা তো কত জায়গা এক সাথে বেড়িয়েছি, কখনও কি মনে হয়েছে তোমার জন্য আমি কোথাও নিজেকে লজ্জিত বোধ করেছি? তবে কেন তুমি এমন করে বললে?

—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম, কিন্তু কাল তুমি এমন ব্যবহার করলে কেন? আমাকে যেন চেনই না! ছোটো কথা বলতে পারতে, একটু হাসতে পারতে, একবার হাত নাড়তে পারতে, তার বেশী তো কিছুই আমি চাই নি। বাবা মার সামনে কেন তুমি অত বদলে গেলে? তাঁদের সাথে কেন আমার পরিচয় করিয়ে দিলে না? তুমি তো আমার বাবা মাকে চেন। তবে? সত্যি কথা বল, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সে কারণ আর কিছুই না, আমার সাথে তোমার পরিচয় আছে জানলে তোমার বাবা মা ভীষণ রাগ করবেন। ইহুদীদের সাথে মেলামেশা করা তাঁরা নিশ্চয়ই পছন্দ করেন না, তাই না?

একটু ইতস্তত করল ও। হঠাৎ বলল,—বেশ, তাই না হয় হল। কিন্তু তাতেই বা কি? সত্যি কথা যখন তুমি জানতে চাইলে, শোন, তুমি কি এতদিনে কিছুই বোঝনি? বোঝনি কেন আমি বাবা মার সামনে তোমাকে নিয়ে যাই নি। না, আমার মান অপমানের কথা ভেবে ও কাজ আমি করিনি। ওটা তোমার ভুল ধারণা। ব্যাপারটা খুবই অপ্রীতিকর হবে তোমার কাছে। হ্যাঁ, আমার মা, ইহুদীদের ঘৃণা করেন। কারণ, তাঁদের বংশের ধারাই ওই। ওঁদের বংশ ইহুদীদের মানুষ বলেই মনে করেন না। তিনি তাই সারাজীবন তাদের সাথে মেলামেশাও করেন নি। তাঁর ঘৃণা এত বেশী যে তিনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, জীবন মরণ সমস্যা হয়, আর যদি সারা দেশে তোমার বাবা ছাড়া আর অন্য কোন ডাক্তার না থাকেন, তবে তিনি হয়ত মারা যাওয়াই পছন্দ করবেন। তোমার সাথে দেখা করার কথা তো তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি আমার বন্ধু হয়েছ শুনলে তিনি যে কি করবেন কে জানে। হয়ত ব্যাপারটাকে হোহেনফেলস বংশের কলঙ্ক বলেই মনে করবেন। তাছাড়া তুমি হয়ত আমাদের ধর্ম বিশ্বাস



নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে, হয়তো তোমাদের নানান প্রতিষ্ঠানগুলো বলসেভিক কমিউনিস্টদের আড্ডা। তুমি তোমার শয়তানি বুদ্ধি দিয়ে আমাকে কাবু করে ফেলবে। এইসব নানান ধারণা তাঁর মনে!

তুমি হাসছ? কিন্তু এসব তাঁর বন্ধমূল ধারণা। আমি তাঁকে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছি, উত্তরে তিনি বলেছেন, এই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তুমি ইহুদীদের খপ্পরে পড়েছ। তুমি তাদের মতই কথা বলছ।

সত্যি বলছি, তোমার সাথে মেলামেশার সবটুকু সময় তাঁকে ফাঁকি দিয়েই আমাকে যোগাড় করতে হয়েছে। কাল তোমার সাথে কথা বলিনি কারণ তোমাকে আমি ব্যাথা দিতে চাইনি। না ভাই না, আমাকে অমন করে বলার কিছুই নেই। তোমার বলার অধিকার নেই। আমার দোষ কি? কেন তুমি সে কথা বুঝবে না?

ওর দিকে আমি তাকিয়েই রইলাম। বুঝতে পারলাম, আমারই মত ওর ছোট্ট মনের মধ্যে কি হচ্ছে? তবুও নিষ্ঠুরের মত জিজ্ঞাসা করলাম, —কিন্তু তোমার বাবা...

—তাঁর কথা আলাদা, বলল খোনরাডিন, আমি কার সাথে মিশি না মিশি তাতে তিনি পরোয়াই করেন না। তিনি জানেন হোহেনফেল্সরা চিরকালই হোহেনফেল্স। তা সে তারা যে পরিবেশেই পুরু না কেন। হ্যাঁ, তুমি যদি কোন সাধারণ ইহুদী তরুণী হতে, তবে হয়তো তাঁর টনক নড়ত। ভাবতেন, তুমি হয়ত আমাকে জপাতে চাইছ টাকা পয়সার লোভে। তবে যদি তুমি বড়লোক ইহুদী তরুণী হতে, তবে হয়ত বিয়েতে দোটানায় পড়তেন আমার কথা ভেবে।

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ও বলল, —অমন করে তাকিয়ে থেক না। আমার বাবা মার জন্ম তো আমি দায়ী নই। তবে আমার দোষ কোথায়? পৃথিবীতে কে কি করছে, কেমন ভাবে মানুষ জন চলছে, তার জন্ম তো তুমি আমাকে দায়ী করতে পার না। মিথ্যা স্বপ্ন না দেখে বাস্তবকে মেনে নেবার মত যথেষ্ট বড় হয়েছি আমরা।

শান্ত হল ও। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার বলল, —আমি যা আমাকে তেমন ভাবেই মেনে নাও ভাই। ভগবানের গড়া পরিবেশ তো আর আমি বদলাতে পারব না। তোমার কাছ থেকে এসব কথা আমি

লুকিয়েই রাখতে চেয়েছিলাম, বুঝিনি, যা সত্যি তা গোপন রাখা যায় না। আমারই উচিত ছিল তোমাকে সব খুলে বলা। সাহস হয়নি ভাই, পাছে তুমি হুঃখ পাও ভেবে। মনে মনে তুমি যে এত ব্যথা পেয়েছ তা বুঝিনি। আমার কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু চেয়েছিলে, দেবার ক্ষমতাই আমার নেই। কিন্তু এখন তো সব কথা শুনলে। বুঝলেও নিশ্চয়ই। ভুলে যাও ভাই যা ঘটেছে সব কিছু। আবার আমরা আগের মত হই।

আমি হাত এগিয়ে দিলাম। লজ্জায় আর ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তাকালে হয়ত আমরা দুজনেই কঁদে ফেলতাম।

ভিতরে গিয়ে ফটকটা আন্তে বন্ধ করে দিল খোনরাডিন। এই ফটকটাই যেন ওর জগত থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছে। আমি আজ জানি, ও-ও জানে আর কোন দিনও ওই ফটকটা পার হয়ে আমি হোহেনফেল্সদের জগতে ঢুকতে পারব না। বাঁকা ঠোঁট; ধারাল নখওয়ালা ঈগল পাখির নক্সাটা আজও যেন আবার আমাকে মুখ ভেংচাল।

আন্তে আন্তে বাগানের পথ ধরে ও এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। বরের দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে ও হাত নেড়ে বিদায় জানাল। আমি কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। চূপ করে দাঁড়িয়েই রইলাম। লোহার ফটকটা বন্ধ হবার সাথে সাথেই আমিও যেন এক অদৃশ্য খাঁচায় বন্দী হয়েছি। খাঁচা-বন্দী আমাকে ওই ঈগল পাখির নক্সাটা ভয় দেখাতে লাগল।

ও আর কোন দিনও আমাকে ওদের বাড়িতে যেতে বলত না। তার-জন্য আমি মনে মনে খুশিই হলাম। আগের মতই আবার আমরা মেলামেশা করতে লাগলাম। যেন কিছুই হয় নি। ও আমাদের বাড়িতে আসত, মার সাথে গল্প করত, কিন্তু আগের থেকে অনেক কম। বেশ বুঝতে পারতাম, আমরা আর আগের মত হতে পারব না। তা মে যতই চেষ্টা করি না কেন।

এমনি করেই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ হতে চলল। তার সাথে সাথে আমাদের মধুর ছেলেবেলা।

সব কিছু শেষ হল কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি ।

পূর্বদিকে ঝড়ের যে কাল মেঘ দেখা গিয়েছিল, তা ঝড়ার রূপ ধরে সব কিছু তছনছ করে দিল । সেই ঝড় খামল প্রায় বারটা বছর পার করে দিয়ে । তখন আমাদের এই গোটা অঞ্চল জুড়ে ধ্বংস স্তূপে ভরা । বার হাজার প্রাণও শেষ হয়ে গিয়েছে ।

বাবা মার সাথে গ্রীষ্মের ছুটি সুইজারল্যান্ডে কাটিয়ে আমি আবার স্কুলে যোগ দিলাম । স্কুল, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জায়গা, সেখানে নানা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা হয়, সেখানে তথাকথিত রাজনীতির কোনও স্থান নেই, এ সবই ছিল আমার ধারণা ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্কুলের একশজন ছাত্র প্রাণ দিয়েছিল, একথা ঠিক । কিন্তু সে তো দেশের জ্ঞাত প্রাণ দেওয়া । নাম না জানা কত বীরই না ইতিহাসের অতীতে এমনি ভাবে প্রাণ দিয়েছেন । তাঁদের নিয়েই তো কবি লিখেছেন,

মহত তাঁহারা আপনার প্রাণ

নিঃশেষে করি দান,

যুদ্ধক্ষেত্রে রেখেছে দেশের মান ।

কাপুরুষ তারা প্রাণ ভয়ে ভীত

পলায়ন করি পিছে,

দেশ জননীর সীমাহীন দ্বন্দ্ব

বিফল করেছে মিছে

কিন্তু চলতি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া তো অন্য ব্যাপার । তাছাড়া স্কুলে পাঠ্য ইতিহাসে তো আমরা আঠার'শ সত্তর খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা পর্যন্তই পড়তাম । চলতি ইতিহাস তো পাঠ্য ছিল না । কি করে তাহলে আমরা জানব ঠিক তখনি দেশের ইতিহাসে কি ঘটেছে ? আমাদের প্রাণপণে মুখস্থ করতে হত অতীত গ্রীক রোমানদের কথা । সোয়াই বিয়াম রাজবংশ আর মহান ফ্রেডরিকের কথা । তাছাড়া ছিল, ফরাসী

বিপ্লব; নেপলিয়ন, বিসমার্ক, এঁদের কথা।

তার বাইরে কোথায় কি ঘটছে তখন তা যে আমি জানতাম না, তা বলছি না। সহরের চারদিকে বড় বড় লাল পোস্টার পড়ে গেল। তাতে ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কথা লেখা। আর লেখা ইহুদীদের বিরুদ্ধে। স্বস্তিকা আর তার পাশে পাশে কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নে দেওয়ালগুলো ভরে গেল। বেকারদের মিছিলে পথে পথে গাড়ির জট বেধে যেতে লাগল।

অবশ্য স্কুলের ক্লাসে আমরা সেই আগের অবস্থাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করতাম।

এমন সময় একজন ইতিহাসের নতুন মাষ্টারমশাই এলেন। নাম, শ্রীযুক্ত পোম্পেটস্‌কী। ড্যানজিগ আর থোনিগস্‌বার্গের কাছাকাছি কোনও অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম ফ্রান্সিয়ান আমাদের স্কুলে। তাঁর উচ্চারণ আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হত।

—ছাত্রেরা, তোমরা যে ইতিহাস পড়তে এসেছ তা দুই ধরনের।

প্রথম দিনেই এইসব কথা বলে তিনি তাঁর পড়ান আরম্ভ করলেন।

—এক, যা ঘটে গিয়েছে, যা অতীত, যার কথা তোমরা বইতে পড়তে পার। অন্য, যা ঘটছে, ঘটবে, বা ঘটতে চলেছে। এই ইতিহাসের কথা স্বার্থবাদী কিছু লোক তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চান। হ্যাঁ, সে সব লোকদের আমরা স্বার্থবাদী বা অস্বাভাবিক শক্তিই বলব। এরা সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আছে আমেরিকায় জার্মানিতে, বিশেষ করে রাশিয়াতে। তারা গোপনে কাজ করে আমাদের মনে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। সেই ভুলে যাওয়া কাহিনীই শোন। বহুযুগ আগে আঠারশ ষট পূর্বাব্দে আর্যদের একটা শাখা গ্রীসে বসবাস আরম্ভ করে। তাদের বলা হত ভোবিয়ানস। পাহাড়ে ঘেরা গ্রীসে তার আগে বাস করত এক অনুন্নত মানব গোষ্ঠি, না ছিল তাদের শিক্ষা দীক্ষা, না ছিল তাদের কোন ভবিষ্যত। আর্যদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীসের অবস্থা বদলে গেল। ক্রমে সে দেশের অধিবাসীরাই হয়ে উঠল পৃথিবীর সব থেকে সভ্য জাতি। দিকে দিকে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিল তারাই।

সময় এগিয়ে চলল, রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর আবার এল এক অন্ধকার যুগ। সে যুগের অবসান হল, জার্মান সাম্রাজ্যের ইতালি দখলের পরই। তখন এল নবজাগরণের যুগ ইতালিতে। তাহলে কি বলা যায় না, জার্মান রক্তই অধঃপাতিত ইতালির বুকে নতুন প্রাণের বীজবপন করেছে। আর জার্মানরাই তো ওই আর্থ রক্তের উত্তরাধিকারী। এমনি করেই আর্থদের আবির্ভাবের পরেই ছোটো মহৎ সভ্যতার জন্ম হল পৃথিবীর বুকে। অশুভ শক্তি কিন্তু এসব কথা সাধারণের কাছে গোপন রাখতেই চায়। চায় নিজেদের স্বার্থে।

এক ঘণ্টা তিনি এসব কথাই বড় গলায় বলে থামলেন। তিনি খোলাখুলি না বললেও, সকলেই, এমন কি আমিও বুঝলাম তিনি কি বলতে চেয়েছেন। তিনি চলে যেতেই ক্লাসে আলোচনার ঝড় উঠল, অনেকেই বলল, সব বাঞ্ছা কথা। কে যেন চোঁচিয়ে উঠল, কই উনি তো চীনের সভ্যতার কথা বললেন না। বললেন না আরব সভ্যতার কথা বা ইনকাদের সম্বন্ধে! আমি কিন্তু ওদের আলোচনার মাঝে চুপ করেই ছিলাম, কি হবে এসবে জড়িয়ে।

অনেকেই, যারা অন্তর্ভাবে ভাবতে শিখেছে, ফুঁসে উঠল, বলল, না ওঁর কথাও ভাবার মত। আর্থরা আসার পরই না প্রাচ্যের উন্নতি হয়েছিল তবে?

যে যাই ভাবুক না কেন, এই মাষ্টারমশাই আসার পরই স্কুলের আবহাওয়া একদম বদলে গেল। এতদিন স্কুলের ছাত্রদের কারও সাথে আমার কোনই গোলমাল ছিল না। যদি কখনও কারও সাথে বিটিমিটি লাগত, তা আপনিই মিটে যেত। তেমন তো সব স্কুলেই ছাত্রদের মাঝে হয়। আমার সম্বন্ধে কারও মনে কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল না।

একদিন স্কুলে গেছি, বন্ধ ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে থমকে গেলাম, সুনলাম ভিতরে ক্লাসে আমাকে নিয়ে আলোচনা চলেছে। কে যেন বলছে, ও তো ইহুদী, ইহুদীরা আর ওর থেকে বেশী কি হবে। কি যে করেছে আমি তা বুঝলাম না। বুঝলাম, অনেকেই এই আলোচনায় সামিল হয়েছে। অনেকের গলাতেই রাগের সুর।

আমি দরজা খুলতেই আলোচনা থামল। দল বেঁধে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কেমন করে যেন তাকাল আমার দিকে, যেন আমাকে তারা এই প্রথম দেখল। কজন পাশ কাটিয়ে বসল গিয়ে তাদের জায়গায়। কিন্তু ছুজন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ছুজনের একজন, বাল্লাখার, সবারই একটা মজাদার নাম দিতে সে ছিল ওস্তাদ। আমার সাথে কথা বলত না। বাকীজন সুউলজ্। বিশাল চেহারা আর খারাপ ব্যবহারের জন্য সবাই ওকে ভয় করত। ওরা ছুজনেই আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন চিড়িয়াখানায় বেবুন দেখছে!

সুউলজ্ হঠাৎ নাক টিপে ধরল, যেন বদ গন্ধ ভরে গেছে দিক। অমন ভাবেই আবার ও আমার দিকে তাকাল ঝগড়া বাধাবে বলে।

আমি একটু ইতস্তত করলাম, ওর সাথে লড়ে গেলে ওকে বেশ শিক্কাই দিতে পারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি লাভ হবে তাতে। সারা স্কুলে যে বিষ ছড়িয়ে গিয়েছে তার বস্তুটুকু আমি দূর করতে পারব। আমি নিশ্চয় নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম, ভাব দেখালাম হোমটাক্স নিয়ে আমার এখনও কিছু করার আছে। ও দিকে খোন্‌রাডিন্ ও তাই করছিল। এত যে সব কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে যেন ওর খেয়ালই ছিল না।

সুউলজ্কে কিছু করলাম না দেখে সাহস পেল বাল্লাখার, হঠাৎ তেড়ে এসে বলল,—তুই প্যালেস্টাইনে চলে যাচ্ছিস না কেন? সেখান থেকেই তো এসেছিস তুই।

কথার শেষে ঝগ করে ও পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে খুতু দিয়ে সেটা সঁটে দিল আমার টেবিলের উপরে। তাতে লেখা, ইহুদীরাই জার্মানির সর্বনাশ করেছে। জাগো সবাই।

ভীষণ রাগে আমি বললাম,—এটা এখান থেকে তুলে নাও।—তুই তুলে দেখ না কি হয়। ভেংচি কেটে ও বলল, তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব।

ক্রাসের সবাই উঠে দাঁড়াল কি হয় দেখবে বলে। আমি দেখলাম খোন্‌রাডিন ও তাদের একজন।

ভীষণ ভয় পেলাম আমি। কি হবে যে কে জানে, কিন্তু এর পর আর পিছিয়ে থাকার যায় না, মান থাকে না তা হলে। নিক্রপায় আমি

প্রাণপণ শক্তিতে ওর মুখে ঘুমি মারলাম। ও পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। তারপর যা ঘটল, তা নিছকই মারামারি ওর সাথে আমার। নাজিদের সাথে ইহুদীদের। আমার লড়াইটা ছিল নেহাতই মান বাঁচাবার মরিয়া লড়াই। তা হলেও ও লড়াই আমি কখনও জিততে পারতাম না। কিন্তু মহাভুল করে বসল বাব্বাখার ও বেমকা। এক বিশাল ঘুমি হাঁকড়াল, আমি চট করে সরে গেলাম। ও টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছোটো বেঙ্কের মাঝে আটকে গেল। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন পোম্পেটস্কাই স্মার। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বাব্বাখার আমাকে দেখিয়ে কান্না ভরা গলায় বলল,—স্মার সোয়ার্জ আমাকে মেরেছে।

ছচোখ দিয়ে ওর জলের ধারা নেমে এল।

স্মার আমার দিকে ভীষণ ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তুমি ওকে মারলে?

—ও আমাকে অপমান করেছিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম।

—তোমাকে অপমান করেছে, কি বলেছে?

—ও আমাকে প্যালেস্টাইন ফিরে যেতে বলেছে।

—ওঃ এই কথা? হেসে বললেন স্মার,—কিন্তু ওতে অপমান হবার কি হল শুনি? আমার তো মনে হয় ও তোমাকে সব বুদ্ধিই দিয়েছিল। বন্ধুর কাজ করেছিল। বস বস তোমরা দুজনেই। লড়তে হয় বাইরে গিয়ে লড়বে। বাব্বাখার তোমাকেও বুদ্ধি একটু ধৈর্য্য ধরতে। নাও, এস এখন ইতিহাসের পড়া আরম্ভ করা যাক।

বিকালে ছুটির পর আমি অপেক্ষা করলাম সবাই যাওয়া পর্যন্ত। ভেবেছিলাম খোন্‌রাডিনও আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। আমাকে সান্ত্বনা দেবে। এখনই তো ওকে আমার সব থেকে বেশী দরকার।

কিন্তু বাইরে বার হয়ে দেখলাম নির্জন আবছা রাস্তা খাঁ খাঁ করছে।

সেদিন থেকে ওকেও আমি এড়িয়ে চলতে লাগলাম। আমার সাথে মেলামেশা করলে যদি ওকেও অপমানিত হতে হয়। ও বোধহয় মনে

মনে এর জন্য খুশিই হয়েছিল।

আবার আমি একা হয়ে পড়লাম। কেউ আমার সাথে কথা বলে না। এমন কি জিমনাস্টিকের মাষ্টার মশাইও আর আমাকে কসরৎ দেখাতে ডাকেন না। পুরাণো স্তারেরাও সবাই যেন হঠাৎ আমার কথা ভুলেই গেলেন।

মনে মনে আমিও খুশিই হলাম। চারদিকে তখন ইহুদী খেদাও আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এত দিন মনে মনে আমি যে আশার আলো দেখতাম, যে স্বপ্ন দেখতাম, তাও একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ডিসেম্বরের এক শীতের দিনের শেষে ক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরতেই বাবা তাঁর চেয়ারে ডাকলেন। গত ছমাসে তাঁর বয়স যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। নিশ্বাসে কষ্ট দেখা দিয়েছে।

আমাকে বসতে বলে তিনি বললেন,—দেখ, আমি যা বলব, তাতে তুমি হুঁথ পাবে জানি। তা হোকও, আমি, তোমার মা, ছুজনেই ঠিক করেছি তোমাকে আমেরিকায় তোমার কাকার কাছে পাঠিয়ে দেব। এ অবস্থা অল্প কিছুদিনের জন্য। এদিকের এই উড়নচড়ে আমরা ঘুঁচলেই আবার ফিরে আসবে। নিউ ইয়র্কে, কাকাই তোমার দেখা শুনা দেখা-পড়ার ব্যবস্থা করবেন। আমরা মনে করি এটাই তোমার পক্ষে ভাল। স্কুলে গত কমান ধরে কি যে হচ্ছে, তা তুমি আমাদের না বললেও জানি। জানি সবকিছুই তোমার সুদূরে হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউনিভার্সিটিতে গেলে অবস্থা তো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই কথা ভাবছি না, না, এ ব্যবস্থা বেশী দিনের জন্য নয়। দেশের লোকের হুঁস ফিরে এলেই তুমি ফিরবে। সে হতে আর কত দিনই বা লাগবে।

একটু চুপ করে থেকে তিনি ফের বললেন,—আমাদের কথা চিন্তা কর না। আমরা থাকব। এই আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের দেশ, আমরা এখানেরই। অন্য আর কাউকে এসবের অধিকার ছেড়ে দিতে পারব না। এ বয়সে আর তা করা সম্ভব নয়।



আবার কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললেন,—তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সামনে সারাটা জীবন পড়ে। সময়ের সাথে নিজেকে বদলে নতুন করে গড়ে নিতে তোমার কষ্ট হবে না। এ বয়সে তাও তো পারব না আমরা।—আশা করি, তুমি এ নিয়ে কোন তর্ক জুড়বে না। যা বলেছি মেনে নেবে। আমাদের আর বিপদে ফেলবে না।

কথা ওখানেই শেষ হল। বড়দিনে আমি স্কুল ছাড়লাম। খোন্‌রাডিনের সাথে ভাব হবার প্রায় এক বছর বাদে। ১৯ শে জানুয়ারি দেশ ছেড়ে পাড়ি জমালাম আমেরিকায়। দেশ ছাড়ার কদিন আগে ছোটো চিঠি পেলাম আমি। একটা কবিতায় লিখেছে বাব্বাখার আর শুউলজ্, সেটা এই রকম।

ওরে বেটা জু, ঘুরছিস তবু,

ব্যাপারখানা কি ?

নেই কি মাথায় ধি ?

যা চলে যা সোজা পথে নরকে।

কিন্মা যানা অস্ট্রেলিয়ার সড়কে

ওরে বেটা জু, যদি ফিরিস কভু,

আমরা ধরে মটকাব তোর ঘাড়।

অক্সা পাবি, বাঁচবিনেরে আর

অন্যটায় লেখা ছিল,

প্রিয় হান্স,

কি লিখব তা ভেবে পাচ্ছি না। বিশ্বাস কর খুবই ব্যথা পেয়েছি আমি তোমার চলে যাওয়ার কথা শুনে। এই ব্যাপারটা যে তোমার কাছেও খুব সহজ নয় তা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝি। দেশকে তুমি কি ভালই না বাসতে। সেই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ আমেরিকায়, যেখানে কিছুই আমাদের মত নয়। জানি এই চিন্তাই তোমাকে সব থেকে বেশী ছুঁখ দিচ্ছে। তবুও বলব, এই বোধ হয় ভাল করলে।

জার্মানি যা হতে চলেছে তাকে বোধহয় পরে আমরা কেউই চিনতে পারব না। সেই নতুন জার্মানির ভাগ্য বিধাতা হবেন এমন একজন, যিনি গোটা দেশের লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের ভাগ্যের সাথে গোটা পৃথিবীর

কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য ও আগামী এক যুগের জন্য নির্ধারিত করে দেবেন।

জানি, তুমি ছুঁতে পাবে যদি বলি, সেই ভাগ্য বিধাতাকে আমি বিশ্বাস করি। হ্যাঁ বন্ধু, আমি তাঁকে বিশ্বাসই করি। তিনিই জার্মানিকে নতুন করে গড়তে পারবেন। তিনিই পারবেন এই দেশকে বিদেশী শক্তির প্রভাব মুক্ত করে, সারা দেশের মানুষদের ভাগ্যের সাথে গোটা পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে। তাঁর সাহায্যেই জার্মানরা আবার তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। বলসেভিকদের হাত থেকে তিনিই রক্ষা করবেন আমাদের। আজ আমরা নিজেদের ভুলে যে সর্বনাশের দোর গোড়ায় পৌঁছেছি, তিনিই আমাদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনবেন।

জানি, এইসব কথায় তোমার সায় নেই। কিন্তু আমি যে এছাড়া আর কোনই আশা দেখিনা বন্ধু। সামনে আমাদের ছোটো মাত্র পথ খোলা, তা হল, হয় স্টালিন, নয় ফুয়েরার। আমি কিন্তু ফুয়েরারকেই চাই। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সত্যতায় আমার সন্দেহ নেই। দেশের ছদ্মবেশে যা আমি মনে মনে চেয়েছিলাম, তিনি ঠিক তাই।

কদিন আগে মার সাথে মিউনিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে তাঁকে আমি দেখেছি। এক নজরে দেখলে মনে হবে সাদা সিঁধা ছোটো-খোটো মানুষ। কিন্তু তাঁর কথা শোনার পর, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর অন্তর দৃষ্টি, সবার মনের সব সন্দেহই দূর করে দেবে। আমরা যখন ফিরে আসি, মার দেখে জল। তিনি বলেছিলেন, ভগবানই তাঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

আমি ছুঁতে বন্ধু একথা ভেবে যে আগামী ছতিন বছর হয়ত জার্মানিতে তোমার স্থান হবে না, কিন্তু তারপর তোমার ফিরে আসার পক্ষে যে কোনই বাধা থাকবে না, সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত। জার্মানিতে তোমার মত সং নাগরিকের প্রয়োজন আছে। ফুয়েরার ভাল মন্দের বিচার করতে পারেন। বদ ইহুদী সং ইহুদীদের মাঝে নিশ্চয়ই তফাৎ রাখবেন তিনি।

‘জন্মস্থানেই, যে বাস করে সে মনে করে সেটাই তার পিতৃভূমি।

সেই স্থান তার পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব,—আমি জানি এটা আমাদের দেশের একটা চলতি প্রবাদ।

তোমার বাবা মা যে তাই দেশ ছাড়তে চাননি এতে আমি খুশি হয়েছি। কেউ তাঁদের কোনও ক্ষতি করবে না এ বিশ্বাসও আমার আছে। অন্য আর পাঁচজন নাগরিকের মতই তাঁরাও এখানে বাস করার সমান অধিকার পাবেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

হয়ত ভবিষ্যতে চলার পথে আবার আমাদের দেখা হবে। প্রিয় বন্ধু হাল, তোমাকে আমি চিরকাল মনে রাখব, আমার মনের অনেকটাই ভরে দিয়েছিলে তুমি। তুমিই আমাকে ভাবতে শিখিয়েছ, কি করে সন্দেহ, কৌতূহল আর বক্তির মাঝ দিয়েই ইশ্বরকে খুঁজতে হয়, পাওয়া যায় আমাদের ত্রাতা যীশুকে।

তোমার খোন্‌রাডিন

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

আমি আমেরিকায় এলাম।

এক একটা করে দিন কেটে ত্রিশটা বছর কেটে গেছে তারপর।  
ত্রিশটা বছর !!

এখানে এসে স্কুলে ভর্তি হলাম, তারপর হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করলাম। আমার মোটেও ইচ্ছা ছিল না, আমি স্বপ্ন দেখতাম কবি হব। কিন্তু কাকা ছিলেন কড়া বাস্তববাদী মানুষ। ধমকে বললেন,—হ্যাঁ, উনি কবি হবেন, নিজেকে কি আজকাল শিলার ভাবছেন নাকি? কবিদের রোজগার কত? আইন পাশ করে আগে উকিল হোক, তারপর মামলার ফাঁকে ফাঁকে যত খুশি কবিতা লিখুক, কেউ না করতে আসবে না।

তাই আমি আজ উকিল। পচিশ বছর বয়স থেকেই আইন ব্যবসা শুরু করেছি। এখন পসার মন্দ নয়। বোস্টনে বিয়ে করেছি। আমার ছেলে নেহাতই ছোট এখন।

আজ কি নেই আমার। সহরে পার্কের পাশে খোলামেল্ল ফ্ল্যাট বাড়ি। গ্রামে ছুটি কাটাবার বাংলো। বহু প্রতিষ্ঠান, যার ইচ্ছাদীর্ঘে ক্ষমত কিছু করে, সে সব প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভ্য। আরও কত কি। কিন্তু আমি জানি, আমি যা হতে চেয়েছিলাম, আমি তা হতে পারিনি। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, আর লেখা হয়নি। ওসব শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল।

প্রথমে অবশ্য বহু অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েই গিয়েছে আমার। টাকা ছিল না তাই সাহসও ছিল না। আজ টাকার অন্তত কোন অভাব আর নেই। পেয়েছিও তাই সব কিছু, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীকে ডেকে আনার মত সাহস আর আমার নেই। মনে মনে নিজেকে আমি তাই ব্যর্থই ভাবি,—কি আর আসে যায় তাতে। তেমন ভাবে ভাবলে হয়ত দেখা যাবে প্রতিটি মানুষই ব্যর্থ।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, মৃত্যুই সবার সাহস, বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা,

যা কিছুসব গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে শেষ করে দেয়। জীবনের সেটাই হল শেষ মানে। হবেও বা। আর ওসব নিয়ে ভাবিনা আজকাল। আজ শুধু জানি, এই ছুনিয়ায় শত্রুর থেকেও বন্ধুই আমার বেশী। তাই জীবনে এমন মুহূর্তও আসে, যখন আমি বেঁচে থাকার সুখে ভরপুর।

যখন অন্তগামী সূর্যের দিকে তাকাই, যখন আকাশে চাঁদের ছায়া, কিংবা যখন দূর পাহাড়র কোলে বরফে আলো ছায়ায় খেলা চলে, তখন কি ভালই না লাগে আমার।

ভাল লাগে যখন যুক্তি দিয়ে কোনও বক্তবাকে অন্য সবার মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বোঝাতে পারি সবাইকে, জাতপাতের চিন্তা নিয়ে মানুষকে বিচার করা ভুল। যে প্রাণ দিতে পারি না, বিচারের নামে সেই প্রাণ শেষ করে দেওয়াও অত্যাচার।

ভাল লাগে, পাঁচটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে। ইজরাইলে এ সাহায্য পাঠাই। সাহায্য করি আরব উদ্বাস্তুদের। আর মাঝে মধ্যে জার্মানিতেও নানান প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করি।

আমার বাবা মা মারা গেছেন। তবে কনসেট্রেশন ক্যাম্পে নয়। নাজিরা তাঁদের ঘরের সামনে একটা নোটিস বুলিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'নাগরিকগণ সাবধান। ইহুদীদের ওড়িয়ে চলুন।' পাড়ায় যারা ইহুদীদের সাথে মেলামেশা করতেন তাঁদেরও নানাভাবে হেনস্থা করা শুরু হয়েছিল। একঘরে করা হয়েছিল বাবা মাকে। শেষ পর্যন্ত এক নাজি পার্টির লোক বাড়ির দরজায় সারাদিন পাহারায় বসল। বাবাও একদিন তাঁর মিলিটারি পোষাক পড়ে, বুকে অন্য পাঁচটা পদকের সাথে প্রথম শ্রেণী আয়রণ ক্রসটা বুলিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভীষণ বেকাদায় পড়ে গেল সেই পাহারাদার। চারদিকে ভীড় জমে গেল। প্রথমে সবাই ভয়ে চুপ করেছিল, শেষে চারদিকে ওই পাহারাদারকে নিয়ে ঠাট্টা টিটকিরি শুরু হয়ে গেল। নিরুপায় পাহারাদার পালিয়ে বাঁচল। আর তাকে দেখা গেল না বাড়ির দরজার সামনে।

এরই কিছুদিন বাদে, মা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, বাবা ঘরের সব দরজা

জানলা বন্ধ করে গ্যাসটা খুলে দিয়েছিলেন। এমনি করেই তাঁরা নিজের দেশের মাটিতেই প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের যত্ন খবর পাওয়ার পর থেকেই আমি জার্মানদের এড়িয়ে চলতাম। কোন জার্মান বই পর্যন্ত পড়তাম না। এমন কি হোল্ডারলিনের লেখাও না। আমি অতীতকে ভুলতেই চাইতাম। তবে জীবনের চলার পথে এমন জার্মানদের দেখাও পেয়েছি, যারা ভদ্র, ভাল। হিটলারের বিরুদ্ধাচরণ করে যারা জেল খেটেছেন। জার্মানদের কারও সাথে হাত মেলাবার আগে আমি তাদের অতীতটা জেনে নিতাম। কারণ, এমন কতই জার্মান আছে যাদের হাতে আমার আত্মীয় বন্ধুদের রক্ত লেগেছে।

যারা হিটলারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, দেখেছি তাদেরও অনেকের মনে কোথায় যেন কি একটা কুণ্ঠার ভাব রয়ে গিয়েছে। ইহুদীদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার জন্য তাঁরা লজ্জিত দুঃখিত।

আমি কিন্তু সবার সামনে ভাব দেখাতাম, এত দিন বাদে জার্মান বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। এই ব্যাপারটা নিজের অজান্তেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য করে বসেছিলাম আমি। আজকাল অবশ্য তা করি জেনে বুঝেই।

সত্যি বলতে কি যে আঘাত আমি পেয়েছি জীবনে তার ক্ষত এখনও আমাকে যন্ত্রনা দেয়। জার্মানির কথা ভাবতে বসলে সেরে ব্যথা যেন টাটিয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল ভুরট্টেমবার্গের একজনের সাথে। তাঁকে স্টুটগার্টের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, চার ভাগের তিন ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমাদের শুলের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তার চিহ্নমাত্র নেই! চিহ্ন নেই হোহেনফেলসদের বাড়িরও। ওর কথা শুনে কেন যেন আমি হেসেছিলাম। অবাক হয়ে তিনি হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কি করে আমি তাঁকে বোঝাব, আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছিল তখন। তাছাড়া আমিই কি ছাই জানি কেন আমি হেসেছিলাম, সব হাসিই কি আনন্দের!

আজ্ঞা এতদিন পরে এ সব কথা মনে পড়ল, কারণ, হঠাৎ জার্মান থেকে আমার কাছে এক আবেদন এসে হাজির। আবেদন এসেছে কার্ল এ্যালেক্সান্ডার জিমনাসিয়ামের কতৃপক্ষের কাছ থেকে। সঙ্গে এসেছে একটা নামের তালিকা। আমাকে স্কুল কতৃপক্ষ অনুরোধ করেছেন কিছু সাহায্য দেবার জন্য। যে অর্থে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ছাত্রদের স্মরণে এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে পারবেন।

জানিনা কোথা থেকে তাঁরা আমার ঠিকানা পেলেন। জানিনা কি করে তারা ভাবতে পারলেন, আমি এখনও তাঁদের কথা ভাবি। ভেবে ছিলাম কাগজগুলো ফেলে দেব। আমার কি দায় তাদের মৃতদের কথা চিন্তা করতে। এ বিষয়ে আমার করার কিছুই নেই। কি দিয়েছিল আমাকে ওরা আমার সেই মৌলটা বছরের জন্য। অপমান, ঘৃণা, না কি কিছুই না? তবে আমারই বা আজ দেবার মত কি থাকতে পারে।

কিন্তু পারলাম না, পড়লাম আবেদনটা। চারশ তাজা প্রাণ নষ্ট হয়েছে ওই যুদ্ধে। নিখোঁজও বহু। তালিকায় তাঁদের নাম সাজান অসম্ভব ধরে। এক এক করে প্রতিটি নাম পড়লাম আমি। এ্যাডমবার্ট, ফ্রিটজ্, মারা গেছে রাশিয়ান ফ্রন্টে। হ্যাঁ ও নামে তখন ছিল মনে পড়ছে। কেমন যে দেখতে ছিল তারা? হায়!

বেহেরাল, কার্ল, হারিয়ে গেছে রাশিয়ার ফ্রন্টে। মৃত বলেই মনে করা হচ্ছে ওদের।

ফ্রান্স কার্ট, ওর কথা তো স্পষ্ট মনে পড়ছে, আতেলদের একজন ছিল। বেচারী! মারা গেছে আফ্রিকায়। আমার মতই বোধহয় স্বপ্ন দেখত ও! হাসত, খেলত, বাঁচতে চাইত। কিন্তু আজ?

ম্যুলায়, ওকেও চিনতাম, মৃত্যু আফ্রিকান ফ্রন্টে। চোখ বুজতেই চোখের সামনে ভেসে এল ওর স্পষ্ট ছবিটা। গালে টোল পড়া, কটা চুল, লম্বা চেহারা! ও আর নেই, এটাই সত্য! হায়!

বাগ্মাখার নুউলজ্ঞরাও যুক্ত। কোথায় কবরস্থ তা জানা যায় নি! কি জানি, এই বোধ হয় ঠিক হয়েছে ওদের। আজও ওদের লেখা সেই লাইন ছোটো ভুলতে পারিনি—

‘ওরে বেটা জু, দিলাম কষে ফু’,

যা চলে যা সোজা পথে নরকে।’

এক এক করে সব নামগুলো পড়লাম। কিন্তু কিছুতেই এইচ অক্ষর দিয়ে লেখা নামের তালিকাটা খুলতে পারলাম না।

হিটলারের আর্দ্রশের জন্ম, আমাদের ক্লাসের ছেটল্লিশ জন ছাত্রের মধ্যে ছাব্বিশ জন প্রাণ দিচ্ছে, ছাব্বিশ জন! তালিকাটা নামিয়ে রাখলাম আমি। তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। ওটা যেন আমারই এক চুঃখময় অতীত থেকে কী এক ভয়ঙ্কর বার্তা বয়ে এনেছে। না চাইতেই এসেছে ও, আমার মনের সব শাস্তি নষ্ট করে দিতে। মনে করিয়ে দিতে চাইছে যা আমি এতদিন ভুলতে চেয়েছি। ওটার থেকে মন ফেরাব বলে ফোন করলাম, এটা ওটা নড়াচড়া করলাম। তবুও ওই তালিকাটাই যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। সব নাম দেখেছি আমি, সব। একটা নাম বাদে, একটা নামই। ওতে কি তার নাম লেখা আছে? তাই তো জানতে চাই আমি। কিন্তু ও তালিকাটা কেন তাহলে আমি খুলতে পারছি না?

ঠিক করলাম ওটা নষ্ট করে ফেলব। এক দিন পরে কি হবে জেনে কার কি হয়েছে। ও আছে কি নেই, কি আর আসে যায় তাতে। ওকে তো আর কখনও আমি ফিরে পাব না।

কিন্তু তা কি সত্যিই কখনো ঘটতে পারে না? ছ’হাত বাড়িয়ে ও এগিয়ে আসবে, আসবে আমার সেই পুরানো বন্ধু, আমি যেন এখনই তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!

তালিকাটা আমি তুলে নিলাম। ছিঁড়তে গেলাম, পারলাম না। কাঁপা হাতে হঠাৎ খুলে ফেললাম সেই পাতাটা, যেখানে এইচ দিয়ে নামগুলো লেখা থাকার কথা।

অনেক নয় মাত্র একটা নামই লেখা সেখানে, একটাই নাম। ফন্



হোহেনফেলস্ থোন্রাডিন, হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে গুত  
য়তুদণ্ডে দণ্ডিত !

তিরিশ বছর বাদে ওকে, আমার বন্ধুকে, আবার আমি ফিরে পেলাম !  
ঠিক আগের মত করেই আমার মনের মধ্যে ।

---